গল্পে হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মুহাম্মদ লুৎফুল হক

হীরে মোতি পান্না

গল্পে হযরত মুহাম্মদ (সা.)

হীরে মোতি পান্না

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

HEEREY MOTI PANNA-I
GOLPEY HAZRAT MUHAMMAD [s]
(DIAMOND PEARL EMERALD-I)
HAZRAT MUHAMMAD [s] IN STORY ;
(A story-book on Hazrat Muhammad [s],
The Holy Prophet) :
Written by Muhmmad Lutful Haque in Bengali and published by
Abu Sayeed Muhammad Omar Ali, Director of Publication, Islamic
Foundation Bangladesh.
August 1988

Price : Tk. 17·00 (Inland) US Dollar 1.00 (Overseas)

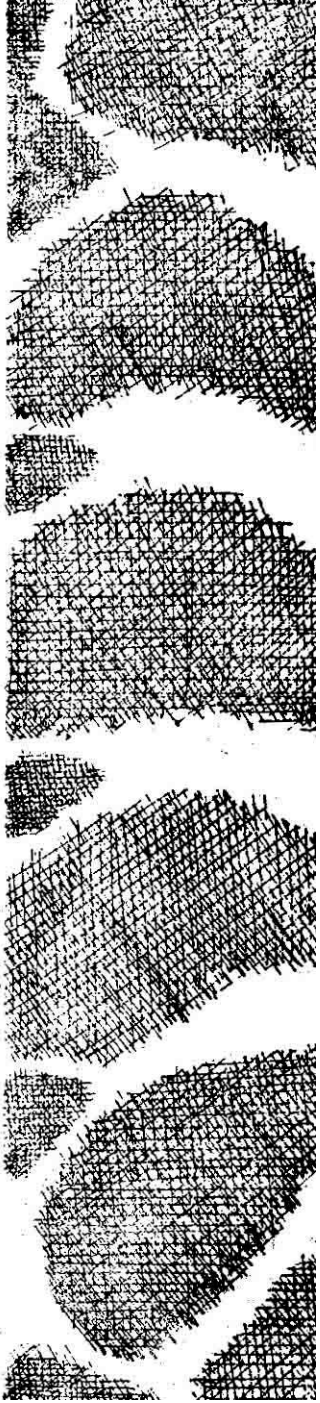

আদরের

আতাউর রব মুহম্মদ আশরাফুল হক

(মাসরূর)-কে

প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও তাঁর
দেখানো পথ তোমার জীবনের পথ ও পাথেয় হোক

আব্বু

মনে রেখো

রসূল করীমের
নামের সঙ্গে পড়তে হয়
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম (সা.)

হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী—
এঁদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে পড়তে হয়
রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হু (রা.)

হযরত খাদীজা, আয়েশা, ফাতিমা—
এঁদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে পড়তে হয়
রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হা (রা.)

সূচিপত্র

মোধান ১॥ যুবকের মুখোমুখি ৫ ॥ বিদায় রাতে ৯॥ সবাই সমান ১২ ॥ য়াদা ১৫॥ মায়া ২০॥ সম্মান ২২॥ সরল জীবন ২৫॥ দায়িত্ব ২৮॥ ্যবহার ৩১॥ অপরাধ ৩৬॥ সবার জন্য ৩৯॥ আড়ম্বর নয় ৪২ ॥ সত-্যার শপথ। ৪৫॥ সমান সমান ৪৯ ॥ তোষামোদ নয় ৫২ ॥ আইনের চোখে ৫৪ ॥ বিলাসবাড়ি ৫৭ ॥

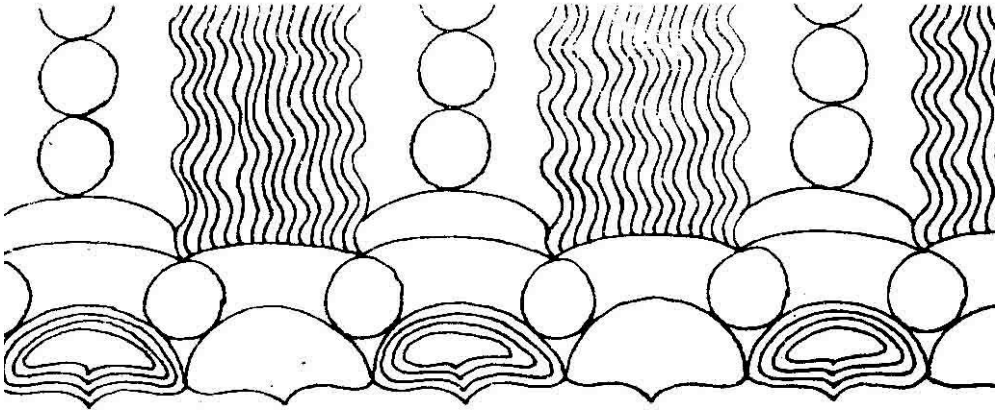

সমাধান

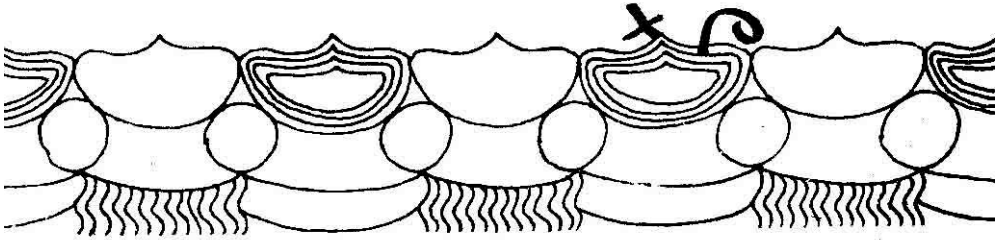

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ। সে সময়কার একটি ঘটনা।

কা'বাঘরে ছাদ নেই। চারপাশের প্রাচীরও প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। ঘরটি আর মেরামত না করলেই নয়। তাছাড়া কা'বাঘরের চারপাশটাও ঠিক না করলেই নয়। একটু বিষ্টি হলেই পানি জমে যায়। চারদিককার নোংরা আর আবর্জনা এসে জমা হয়। এক বিশ্রী অবস্থা হয় তখন। মক্কার সকল গোত্রের লোকেরা পরামর্শ সভায় বসল। কা'বাঘর মেরামতের জন্যে সমস্ত আয়োজন করল। নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি করে নিল। অল্প সময়ের মধ্যে ঘর মেরামতের কাজও তারা শেষ করে ফেলল।

কিন্তু গোলমাল বাধল 'হাজ্‌রে আসওয়াদ' নিয়ে। 'হাজ্‌রে আসওয়াদ' মানে কালোপাথর। কা'বাঘরেই এর স্থান। আগেও ছিল, এখনও আছে। পাথরটিকে সবাই খুব সম্মান করে।

পাথরটিকে কা'বাঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাতে হবে। কিন্তু এমন সম্মানিত পাথর কে বহন করবে? কোন্ গোত্রের লোকেরা পাথরটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাবে? যারা এ সুযোগ পাবে, তাদের সম্মান যে বহু গুণে বেড়ে যাবে!

ফল যা হবার তাই হল। প্রতিটি গোত্রই এ পাথর বহন করে নির্দিষ্ট স্থানে বসানোর দাবি জানাল। গোত্রগুলোর মধ্যে এ নিয়ে বাধল তুমুল হট্টগোল।

প্রতিটি গোত্রই নিজ নিজ গোত্রের পক্ষে কথা বলল। শুরু হল একের বিরুদ্ধে অন্যের ঝগড়া। অবশেষে গোত্রগুলোর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের আশংকা দেখা দিল। সকল গোত্রই ঢাল-তলোয়ার, বর্শা নিয়ে তৈরি। যুদ্ধ বাধে বাধে অবস্থা।

এদের মধ্যে দু'একজন ছিলেন খুবই ভাল মানুষ। তাঁরা ভাবলেন—যুগ যুগ ধরে সকল দেশের সকল মানুষ কা'বাঘরকে সম্মান করে আসছে। 'হাজ্‌রে আসওয়াদ'কে সবাই পবিত্র বলে জানে। আর সেই 'হাজ্‌রে আসওয়াদ' নিয়েই মারামারি কাটাকাটি হবে—এ কেমন কথা! তাঁরা গোত্রগুলোর মধ্যে একটি আপস-রফার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কোন গোত্রই তাদের দাবি ছাড়ে না।

সব গোত্রের লোকেরাই উত্তেজিত। ঢাল-তলোয়ার নিয়ে সবাই প্রস্তুত। এই বুঝি লড়াই শুরু হল।

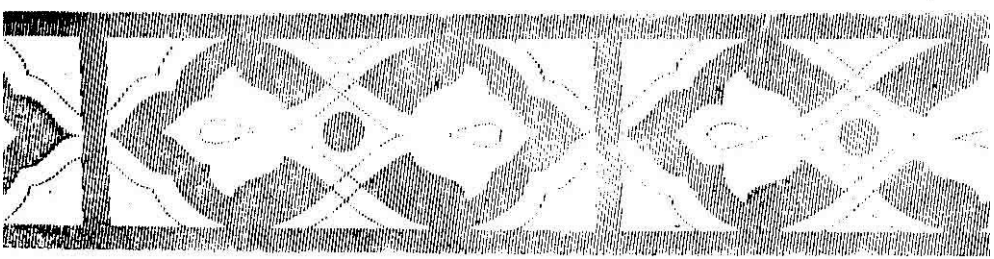

বৃদ্ধ আবূ উমাইয়া আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করে বললেন,—হে মক্কাবাসীরা, ক্ষান্ত হও, আমার কথা শোন। এই পবিত্র ঘর নিয়ে কেন আমরা রক্তপাত করব? এটা কি ঠিক? তোমরা ধৈর্য ধর, একটু অপেক্ষা কর।

সকলে শুনল তাঁর কথা। বুঝল, সত্যিই—এ পবিত্র ঘর নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদ করা ঠিক না। কিন্তু সমস্যার সমাধান কোথায়? 'হাজ্‌রে আসওয়াদ' কে বহন করবে?

বৃদ্ধ প্রস্তাব করলেন—যে ব্যক্তি কাল ফজরে কা'বাঘরে আসবে, সে-ই এর ফয়সালা দেবে। সে যে ফয়সালা দেবে, আমরা সকলে তাই মেনে নেব।

সকলে বৃদ্ধের প্রস্তাবে রাজি হল।

পরদিন ফজর।

কা'বায় আগমনকারী প্রথম ব্যক্তির জন্যে সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকের মনেই তখন চিন্তা। যে আসবে' সে কে? কেমন লোক হবে সে? কোন্ পক্ষে সে রায় দেবে? তাঁর ফয়সালা যদি সকলের পসন্দ না হয়? তাহলে?

এমনি সময়ে সকলে এক সঙ্গেই চিৎকার করে উঠল,—ঐ যে আল-আমীন আসছেন। আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ আসছেন। আমরা নিশ্চয়ই তাঁর ফয়সালা মেনে নেব।

মুহাম্মদ (সা.) কা'বাঘরের চত্বরে এসে হাযির হলেন। সকলেই তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। গোত্রের সর্দাররা তাঁকে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলল। বলল, ঝগড়ার মীমাংসা করে দিতে হবে।

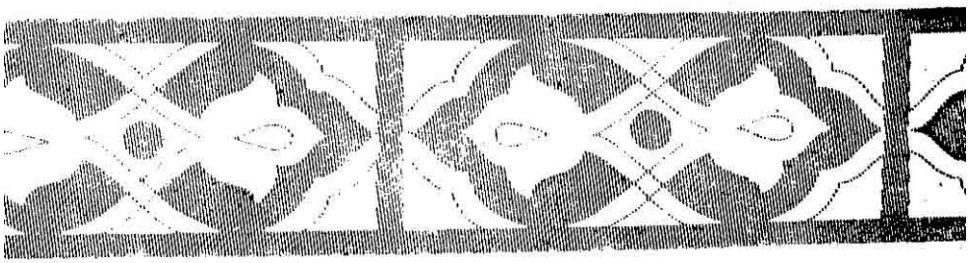

মুহাম্মদ (সা.) দেখলেন, ব্যাপারটা খুব জটিল। অল্পতেই যুদ্ধ শুরু হতে পারে। আর একবার শুরু হলে আর রক্ষে নেই। যুগ যুগ ধরে চলবে এই রক্তপাত। তা'ছাড়া 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ' নিয়ে যুদ্ধ বাধবে—এটা তো ঠিক নয়। তাতে যে কা'বাঘরের পবিত্রতা নষ্ট হবে।

ইচ্ছা করলে তিনি পাথরখানা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে পারতেন। যে সম্মানের জন্যে এত বিবাদ, সেই সম্মানের সবটাই তিনি নিজে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। কেননা যশ, খ্যাতির কোন লোভ তাঁর ছিল না। তিনি চান সমস্যার সমাধান।

তিনি বিবাদ মীমাংসার পথ ঠিক করে ফেললেন। প্রতি গোত্র থেকে একজন করে প্রতিনিধি ডাকলেন। প্রতিনিধিদের নিয়ে তিনি 'হাজ্‌রে আস-ওয়াদে'র কাছে গেলেন।

তারপর মেঝেতে একখানা চাদর বিছালেন। নিজ হাতে পাথরখানা তুলে চাদরের উপর রাখলেন। গোত্রের সর্দারদের বললেন,—আপনারা চাদরের এক-এক প্রান্ত ধরুন। পাথরটি যেখানে রাখতে হবে সেখানে নিয়ে চলুন।

কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই নীরবে আল-আমীন মুহাম্মদের নির্দেশ মেনে চলল। যেখানে পাথরটি রাখতে হবে সবাই সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। মুহাম্মদ (সা.) নিজ হাতে পাথরখানা নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিলেন।

আল-আমীন মুহাম্মদ (সা.)-এর উপস্থিত বুদ্ধির বদৌলতে একটি জটিল সমস্যার সমাধান হল। পবিত্র পাথর নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের কলহ দূর হল।

কারো মনে আর কোন ক্ষোভ রইল না। সবাই সন্তুষ্ট হল তাঁর মীমাংসায়। আল-আমীন মুহাম্মদ (সা.)-এর বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সবাই মুগ্ধ।

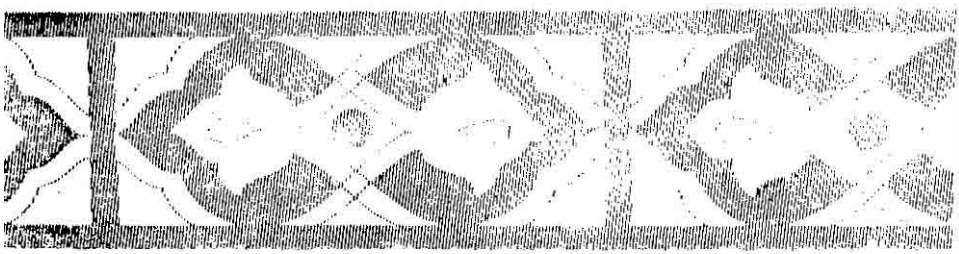

ভয়-ভীতি, বিপদ-আপদ, সবার জীবনেই আসে। কারো বা কম, কা
বা বেশি।

বিপদে পড়লে আমরা একে অপরের সাহায্য চাই। কিন্তু বিপদে পড়
ভয় পেলে যাকে ডাকি—তাঁর ক্ষমতা কতটুকু? কতটুকু তিনি সাহায্য কর
পারেন? তা'ছাড়া তিনিও তো কখনো কখনো বিপদে পড়েন। তখন সাহা
জন্যে আর একজনকে ডাকেন।

আসলে বিপদে-আপদে আমাদের একজনকেই ডাকা উচিত। তি
হলেন, আল্লাহ্। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা। একমাত্র তি

পারেন আমাদের রক্ষা করতে, সাহায্য করতে।

যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রসূলগণ এ শিক্ষাই আমাদের জন্যে রেখে গেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনেও এরূপ অনেক ঘটনা রয়েছে। এ সব ঘটনার মধ্য দিয়েও আমরা বিপদ-আপদে, দুঃখ-যন্ত্রণায় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করার শিক্ষা পাই।

একবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশেষ কোন কাজে ঘর থেকে বেরিয়েছেন। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বিশ্রামের জন্য সুবিধামত একটি জায়গা বেছে নেন। ক্লান্তিতে তাঁর দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসে। এক সময় তিনি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন।

ঘুরতে ঘুরতে এক বেদুঈন সেখানে এসে হাযির। হাতে তার খোলা তরবারি। চকচক করছে। নিরস্ত্র মহানবী (সা.)-কে দেখে সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। জেগে ওঠে পাশবিক প্রবৃত্তি। শিকার তার একেবারে হাতের মুঠোয়। মুহাম্মদকে সে এক্ষুণি হত্যা করবে।

মহানবী (সা.)-এর কাঁধ বরাবর সে তরবারি উঁচু করে ধরল। চিৎকার করে বলে উঠল,—বল আমার হাত থেকে এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে?

চিৎকার শুনে মহানবী (সা.)-এর ঘুম গেল ভেঙে। তিনি সব দেখলেন। বুঝলেন যে, তাঁকে হত্যার চেষ্টা হচ্ছে।

কিন্তু মহানবী (সা.) কোনরকম ভয় পেলেন না। বিচলিত হলেন না এতটুকু। তিনি ভাবলেন, ও তো সামান্য একটা মানুষ। ওর ক্ষমতা আর

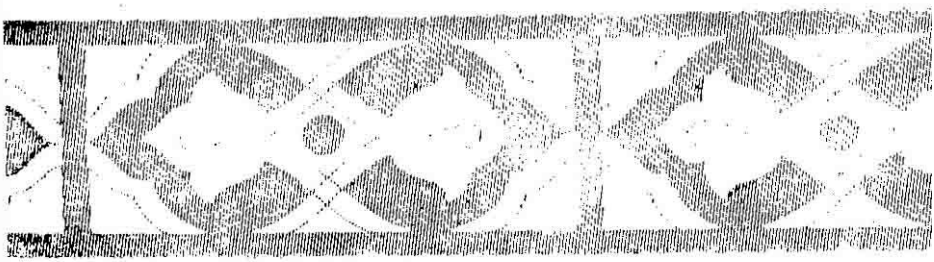

কতটুকু! আমার পাশে তো আল্লাহ্ রয়েছেন। তিনি তো সর্বশক্তিমান, সবারই প্রতিপালক। সুতরাং ভয় কিসের? তিনিই তো পারেন আমাকে রক্ষা করতে।

মহানবী (সা.)-এর বুক ভরে উঠল। নিজেকে আল্লাহ্র হাতে সমর্পণ করলেন তিনি। নির্ভয়ে বলে উঠলেন,—আল্লাহ্, আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করবেন।

মহানবী (সা.)-এর কথা শুনে বেদুঈন তো একেবারে অবাক। তার হাতে খোলা তরবারি। ইচ্ছা করলে মুহাম্মদ-কে যে কোন মুহূর্তে দু'ভাগ করে ফেলতে পারে। অথচ তিনি কিনা বলছেন যে, আল্লাহ্ই তাঁকে রক্ষা করবেন!

বেদুঈন ভীষণভাবে বিস্মিত হল। তার অন্তরে নতুন ভাবের সঞ্চার হল। হাত দু'টি শিথিল হয়ে গেল। কখন যে হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল, বেদুঈন তা টেরও পেল না।

মহানবী (সা.) সবই দেখলেন। বেদুঈনের মনের অবস্থাও তিনি লক্ষ্য করলেন! তার হাত থেকে খসে পড়া তরবারি তুলে নিলেন। বললেন,—বল এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে আমার হাত থেকে?

মহানবী (সা.)-এর কথা শুনে বেদুঈন ভীত হল। মুহূর্তে নবীজীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল,—হুযুর আপনি! আপনি ছাড়া আর কে আমাকে রক্ষা করবে!

মহানবী (সা.) মৃদু হাসলেন। বেদুঈনের হাত ধরে নিজের পাশে

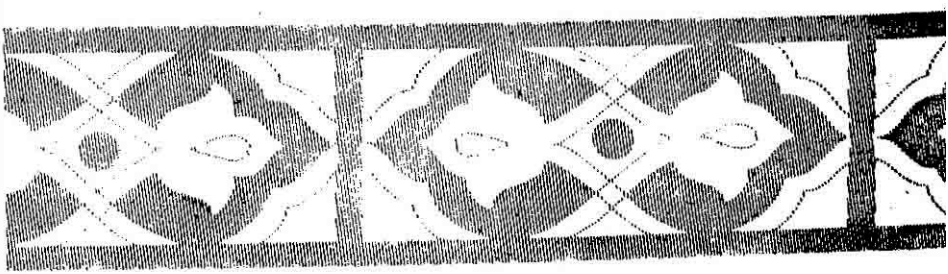

বসালেন। বললেন,—ছি! ও কথা বলতে নেই। আমি তোমাকে রক্ষা করার কে? তা'ছাড়া চোখের সামনেই তো দেখলে, কে আমাকে রক্ষা করলেন। করুণাময় আল্লাহ্। যিনি সর্বশক্তিমান। বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে তিনিই একমাত্র ভরসা।

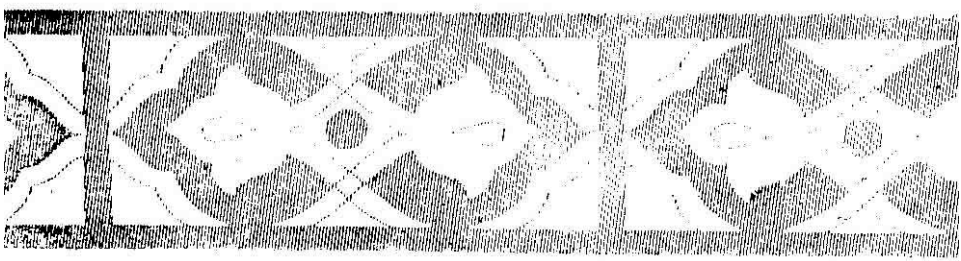

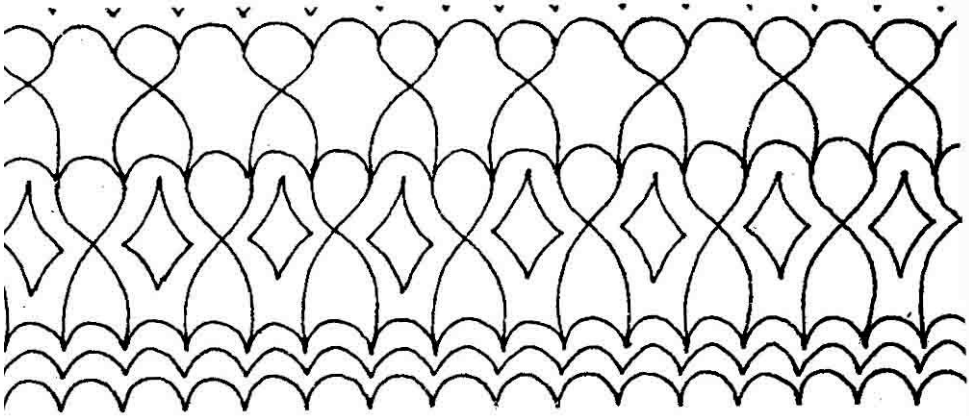

বিদায় রাতে

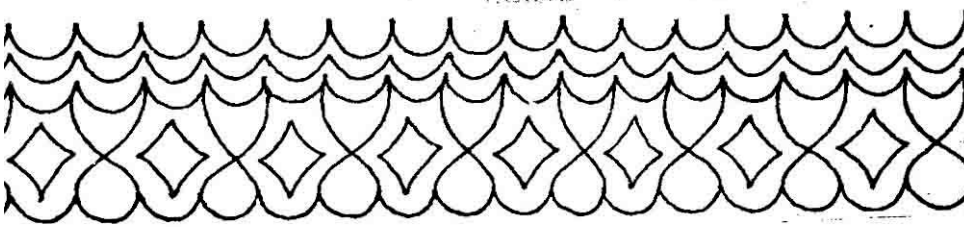

কাফিরদের বর্বরতা দিনে দিনে চরম আকার ধারণ করল। অসহনীয় হয়ে উঠল তাদের অত্যাচার। কিন্তু কি করার আছে নবদীক্ষিত মুসলমানদের? সংখ্যায় তারা ক'জন? কোথায় তাদের অস্ত্রবল? কে দেবে তাদের সমর্থন? কাফিরদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার মত সুযোগ যে তখনও হয়ে ওঠে নি। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাই তারা মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হল। পাড়ি জমালো বিদেশে—আশ্রয় নিল অচেনা-অজানা লোকালয়ে।

মুসলমানদের নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত করেও কাফিররা খুশি হতে পারল না। তাদের আশঙ্কা ক্রমশ বাড়তে লাগল। তারা দেখল, মুসল-

মানদের সংখ্যা ও শক্তি দিন দিন বাড়ছে। অত্যাচারের মাত্রা যে হারে বাড়ছে—মুসলমানদের মনোবলও যেন সেই হারে বাড়ছে। কাফিররা ভাবল—এভাবে আর চলতে দেয়া যায় না। অবিলম্বে এর কিছু একটা বিহিত না করলেই নয়।

কাফির সর্দাররা পরামর্শ সভায় বসল। সিদ্ধান্ত হল—মুসলমান দলপতিকে নীরবে সরিয়ে দিতে হবে পৃথিবী থেকে। রাতের আঁধারে সবাই একযোগে তাঁর বাড়িতে চড়াও হবে। তাঁর বুকে গলায় চালিয়ে দেবে ধারালো খঞ্জর। নিমেষে একটি জীবনের ঘটবে অবসান। পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে ইসলামের দীপশিখা। এতে কোন ঝুঁকি নেই, বিপদ নেই।

কাফির সর্দারদের এই ষড়যন্ত্রের কথা রসূল (সা.)-এর জানতে বাকি রইল না। কিন্তু তিনি কি করবেন? এই ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করার মত শক্তি-সামর্থ্য তাঁর কোথায়? তিনি ভাবলেন—এদের সঙ্গে এই মুহূর্তে কোন বিবাদ নয়। বরং নিজ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই কি যাওয়া যায়? তাঁর যে অনেক দায়িত্ব। সারা দেশে তিনি 'আল-আমীন' বলে পরিচিতি। তিনি সবারই বিশ্বাসের পাত্র। এমনকি যে কাফির গোষ্ঠী তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তারাও তাঁকে বিশ্বাস করে মনেপ্রাণে। তাঁর সততার ব্যাপারে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আর সে কারণে অনেক লোকই তার নিকট তাদের টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পদ জমা রাখত। সবাই জানত, এই গচ্ছিত সম্পদ খোয়া যাবে না।

তিনি চলে গেলে এই গচ্ছিত মালের কি হবে? এগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে? যারা আসল মালিক তারা বঞ্চিত হবে তাদের প্রাপ্য সম্পদ থেকে;

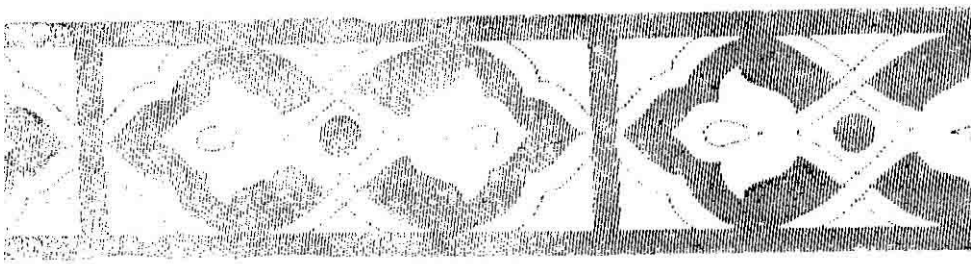

এ যে আমানতের খেয়ানত! এ যে মস্ত বড় অপরাধ! আল্লাহ্‌র কাছে তিনি এর কি জবাব দেবেন?

রাত গভীর হয়ে আসছে। লোকজনের কোলাহল, চলাচলও বন্ধ হয়ে গেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আর বিলম্ব করার সময় নেই। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে। যে কোন মুহূর্তে কাফিররা আক্রমণ করতে পারে।

কিশোর বালক আলীকে ডেকে পাঠালেন তিনি। সমস্ত গচ্ছিত মালের একটি তালিকা তৈরি করে আলীকে সব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন,—সতর্ক থেকো, যেন কোন মাল খোয়া না যায়। প্রত্যেকে যেন তাদের আমানত ফিরে পায়।

কিশোর বালক ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ মুতাবিক দায়িত্ব পালন করার ওয়াদা করল। মহানবী (সা.) নিশ্চিত হলেন। শত্রুদের গচ্ছিত আমানত খেয়ানত না হওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত হলেন। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বন্ধু আবূ বকরকে সঙ্গে নিয়ে সকলের অগোচরে মদীনার পথে যাত্রা করলেন।

এমনি প্রবল ছিল মহানবী (সা.)-এর দায়িত্ববোধ। চারদিকে যখন ষড়যন্ত্র, শত্রু যখন ঘরের দুয়ারে, তখনও তিনি দায়িত্বের কথা ভুললেন না। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও যার যার গচ্ছিত সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।

বিপদের সময়ও দায়িত্ব পালন করা থেকে পিছিয়ে থাকতে নেই।

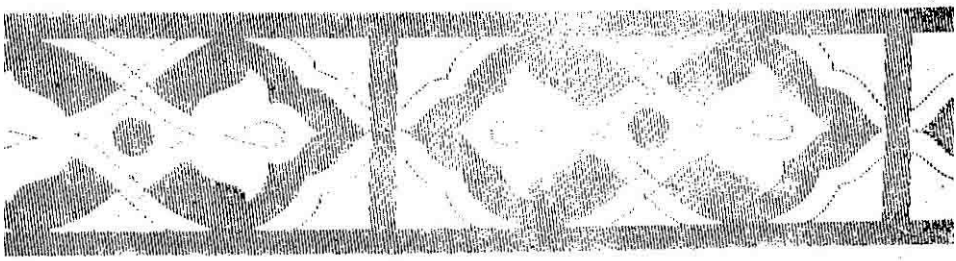

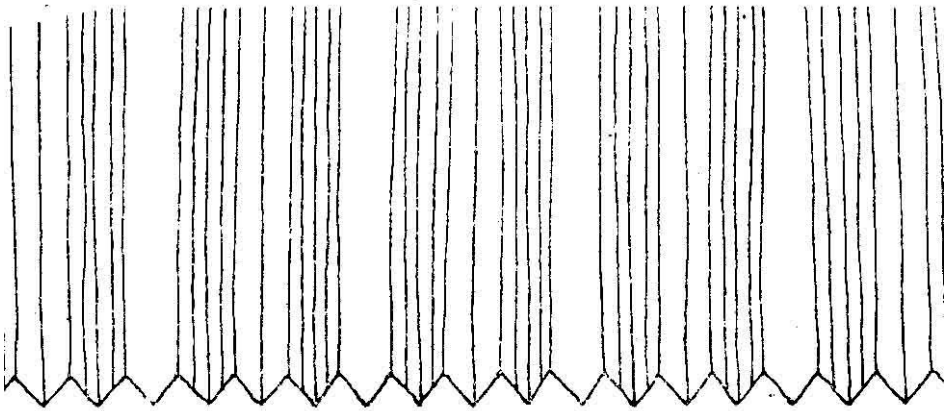

সবাই সমান

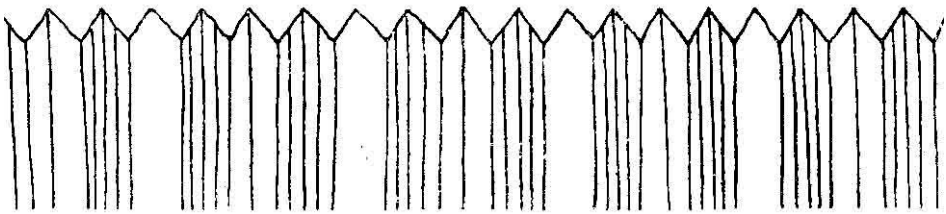

দিনে দিনে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে। শক্তি বাড়ছে। কোনভাবেই তাদের জব্দ করা যাচ্ছে না। কাফিররা পড়ল মহাভাবনায়।

সবাই মিলে ঠিক করল—ভয়-ডর দেখিয়ে কোন লাভ নেই। এবার সরাসরি মদীনা আক্রমণের পালা। মুসলমানদের মেরে-কেটে কুচি কুচি করতে হবে। তাহলেই বাবা হোবলের শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হবে। ইসলামের নাম মুছে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে।

যেমনি ভাবনা, তেমনি কাজ। যুদ্ধের সব আয়োজন শেষ। হাজার

সৈন্যের বিরাট বাহিনী তৈরি হল। ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে কাফিররা রওয়ানা হল মদীনার দিকে।

মহানবী (সা.) এখন কি করবেন? খোলা তরবারি হাতে শত্রুরা আসছে এগিয়ে। যাকে সামনে পাবে, তাকেই মারবে, কাটবে, হত্যা করবে। ধর্মের কথায়, নীতিকথায় তাদের অন্তর গলবে না।

মহানবী (সা.) ভাবলেন—আর বসে থাকা নয়। এবার তৈরি হওয়ার পালা। তরবারি দিয়েই শত্রুর মুকাবিলা করতে হবে। তিনি আনসার-মুহাজির সকলকে ডাকলেন। কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন। যুদ্ধের জন্য সকলকে তৈরি হওয়ার হুকুম দিলেন।

দেখতে দেখতে মুসলমানরা তৈরি হয়ে গেলেন। সংখ্যায় তারা খুবই কম, মাত্র ৩১৩ জন। ঢাল-তলোয়ার, তীর-ধনুক, লাঠি-সড়কি, খাদ্য-খাবার কোনটাই তেমন নেই। কিন্তু তাতে কি? তাঁদের অন্তরে আছে ঈমানের তেজ। আছে আল্লাহ্‌র প্রতি অগাধ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে সম্বল করেই তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। শক্ত হাতে শত্রুর মুকাবিলা করার শপথ নিলেন। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুললেন।

কিন্তু তাঁরা পথ চলবেন কিভাবে? তাঁদের যানবাহন কোথায়? সঙ্গে রয়েছে সামান্য ক'টি উট। উট না হলে পথ চলাই যে কষ্টকর হবে। কিন্তু উট তাঁরা কোথায় পাবেন? এমন দুর্দিনে উট কে দেবে? অথচ বসে থাকার সময় নেই। পথ তাদের চলতেই হবে।

মহানবী (সা.) সাহাবিগণকে নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন। ঠিক হল,

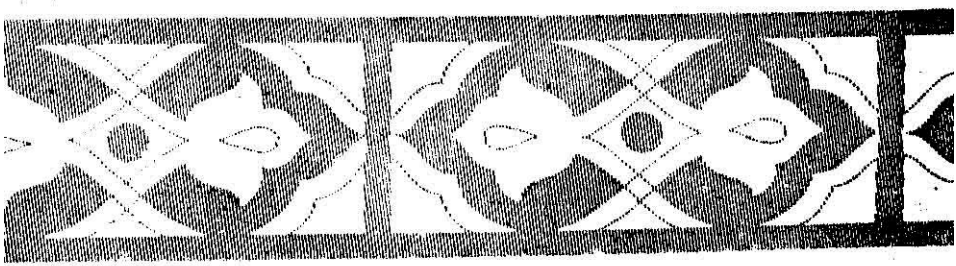

সাহাবিগণ নিজেদের মধ্যে উটগুলো ভাগাভাগি করে নেবেন। তিন-তিনজন সাহাবি একটি করে উট পেলেন। কেউ উটের পিঠে উঠে বসেন, কেউ চলেন পায়ে হেঁটে। কিছুদূর চলার পর পালাবদল হয়। যিনি হাঁটছিলেন, তিনি উটের পিঠে বসেন। আর যিনি উটের পিঠে ছিলেন, তিনি পায়ে চলা শুরু করেন। এমনিভাবে তাঁরা এগিয়ে চলেন সামনের দিকে।

কিন্তু সমস্যা হল মহানবী (সা.)-এর দলকে নিয়ে। তাঁর দলে ছিলেন আরও দু'জন সাহাবী। সাহাবিগণ ভাবলেন—মহানবী (সা.) আমাদের সেনাপতি, আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। তিনি হেঁটে যাবেন, আর আমরা উটের পিঠে বসে যাব—এ কেমন কথা! না, এ হতে পারে না,—হয় না।

সাহাবিগণ কোনভাবেই উটে চড়তে রাজি হলেন না। তাঁরা বললেন,—ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমরা পায়ে হেঁটেই চলতে পারব। আপনি আমাদের সেনাপতি। আপনি উটের পিঠে উঠুন।

মহানবী (সা.)-ও একেবারে নাছোড়বান্দা। তিনি উটের পিঠে উঠতে রাজি হলেন না। ভাবলেন—সাধারণ সৈন্য বলেই তারা হেঁটে যাবে—এ কেমন কথা? তাদেরও তো সুখ-দুঃখ আছে। ক্লান্তি আছে। তিনি বললেন,—দেখ, তোমরা আমার চেয়ে বেশি হাঁটতে পারবে না। তা ছাড়া সওয়াবের জন্যে তোমাদের লোভ যতটুকু, আমার লোভ তার চেয়েও বেশি।

অবশেষে মহানবী (সা.)-এর জয় হল। তিনজনে একটি উটে ভাগাভাগি করে, পালাবদল করে এগিয়ে চললেন। এ দুনিয়ায় ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, চাকর-মনিবের কোন পার্থক্য নেই। মনিব মহা আরামে থাকবে আর চাকর-শ্রমিক শুধুই কষ্ট করবে—আল্লাহ্‌র রাজ্যে এ নিয়ম অচল।

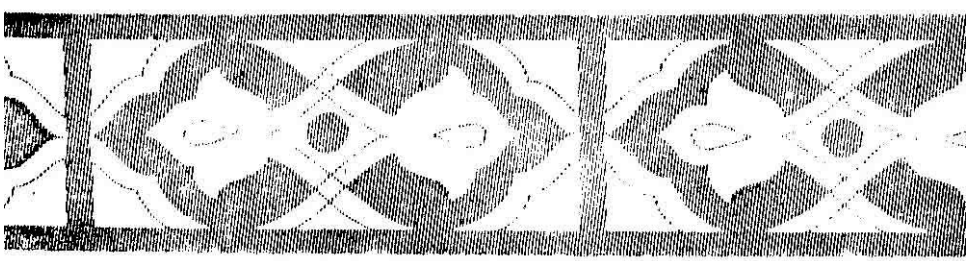

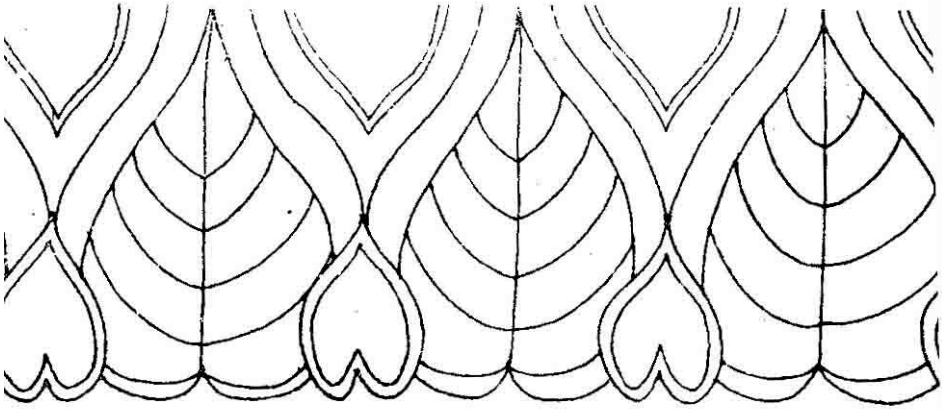

ওয়াদা

না, আর দেরি নয়। এবার যিলক'দ্ মাসেই তাঁরা মক্কায় যাবেন। পবিত্র কা'বাঘর তওয়াফ করবেন। সেখানে নামায পড়বেন। আবার ফিরে আসবেন মদীনায়।

রসূলের এই সিদ্ধান্তের কথা বাতাসের বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমানদের স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠল পুরোনো দিনের অনেক কথা—তাঁদের বাড়ি-ঘর, পরিচিত পথ-ঘাট, আত্মীয়-স্বজন, কা'বাঘর। কাফিরদের অত্যাচার। অনেক কিছু।

তাঁদের মনে পড়ে গেল ছয় বছর আগের একদিনের ঘটনা। সেদিন তাঁরা

মক্কা ছেড়ে মদীনার পথে পা বাড়িয়েছিলেন কাফিরদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে। তাঁদের মনে ছিল ভয়। আজ তাঁরা মক্কায় যাবেন বিজয়ীর বেশে। স্বাধীনভাবে।

আবার তাঁরা স্বদেশে যাবেন। আত্মীয়-স্বজনের দেখা পাবেন। কা'বাঘরে নামায পড়বেন। এ কি কম আনন্দের কথা!

সদলবলে মুসলমানরা এগিয়ে চলেছেন মক্কার পথে। একজন-দু'জন নয়, ১৪০০ ভক্ত সাহাবা সারি বেঁধে পথ চলেছেন। দলপতি হিসাবে সঙ্গে রয়েছেন মহানবী মুহাম্মদ (সা.)।

কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাফেলা বেশি দূর এগুতে পারল না। মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে কাফিররা তৈরি হল। হুদায়বিয়ার ধূ ধূ প্রান্তরে মুসলমানদের গতিরোধ করল। তাদের কথা—কোনভাবেই মুসলমানদের মক্কায় ঢুকতে দেয়া হবে না।

মহানবী (সা.)-এর ভাবনা কিন্তু অন্যরকম। তিনি কাফিরদের সঙ্গে কোনরকম ঝগড়া-বিবাদ করতে রাজি নন। সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠালেন।

উভয় দলের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা হল। সন্ধির শর্তাবলী মোটামুটি ঠিকঠাক।

দু'টি শর্ত ছিল খুবই অদ্ভুত। একেবারে মুসলমানদের বিপক্ষে। শর্ত দু'টি হল ঃ

১. কাফিরদের মধ্যে কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় যেতে পারবে না। যদি চলে যায়, তা'হলে মদীনার মুসলমানরা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।
২. কোন মুসলমান যদি মদীনা ছেড়ে মক্কা যেতে চায়, তাকে বাধা দে'য়া চলবে না।

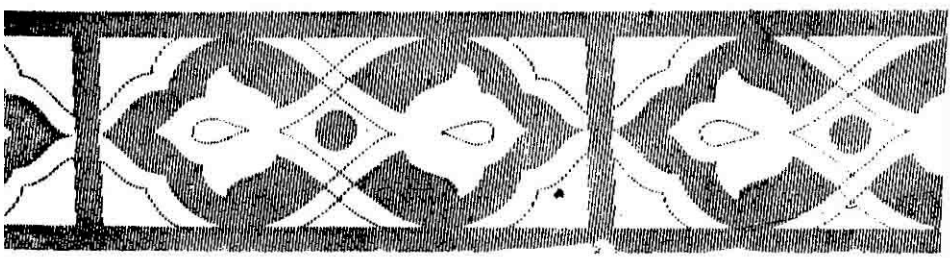

মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই এই শর্ত দু'টি মানতে আপত্তি করল। তারা প্রতিবাদ করে বলল,---এটা কি একটা শর্ত হল? তাদের চেয়ে আমরা কম কিসে? কেন তাদের কাছে নতি স্বীকার করব?

অন্যান্য সঙ্গী-সাথী তেমন আপত্তি করল না। তারা বলল,--তোমরা কেন জিদ ধরেছ? তোমরা কি মহানবী (সা.)-এর সে কথা ভুলে গেছ যে—যারা সবর করে, তারাই সফলকাম হয়? আল্লাহ্ সব সময় সবরকারীদের পক্ষে থাকেন?

আলাপ-আলোচনা শেষ। এবার চুক্তিপত্রে দস্তখতের পালা। কাফিরদের প্রতিনিধি সুহায়েল। মুসলমানদের পক্ষে মহানবী (সা.)। দু'জনে বসে শেষ বারের মত চুক্তিপত্রের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পরীক্ষা করে দেখলেন।

চুক্তিপত্রে তখনও দস্তখত হয় নি। ঠিক এমনি সময়ে সেখানে এক লোক এসে হাজির। তার হাতে-পায়ে শিকল। শিকলের ভারে হাতে-পায়ে দাগ পড়ে গেছে। সমস্ত শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে ……। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে গেছে। মুসলমানদের কাছে এসে আর্তনাদ করে বলল ঃ আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে বাঁচান। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

লোকটির কথা শুনে মুসলমানগণ সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। যত্ন করে তাকে কাছে বসাল। সান্ত্বনা দিয়ে বলল ঃ কি হয়েছে তোমার?

লোকটি বলল ঃ আমি মুসলমান হয়েছি। তাই ওরা আমাকে মেরেছে। অত্যাচার করছে।

ঃ তোমার হাতে-পায়ে শিকল কেন?

ঃ ওরা আমাকে আপনাদের কাছে আসতে দেবে না। তাই শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। আমি পালিয়ে এসেছি। আমাকে আপনারা আশ্রয় দিন।

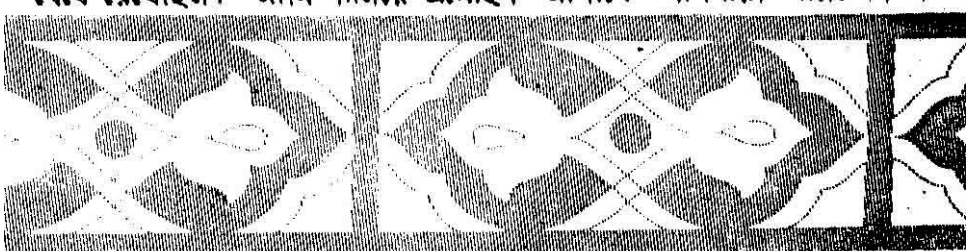

আগন্তুক লোকটি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। মনে মনে ভাবছে—এখন সে মুসলমানদের শিবিরে। কাফিররা আর তাকে ধরতে পারবে না। তাকে আর অত্যাচার সহ্য করতে হবে না।

কাফির প্রতিনিধি সুহায়েল তখনও মহানবী (সা.)-এর সংগে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে চুক্তিপত্র পরীক্ষা করে দেখছে।

আগন্তুক মুসলমানের কণ্ঠ শুনে সে চমকে উঠল। এ যে তারই অতি পরিচিত কণ্ঠ! তারই ছেলে আবূ জান্দাল! সে এখানে এল কেমন করে?

সুহায়েল পেছন ফিরে তাকাল। আবূ জান্দালকে দেখে সে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। রাগে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। যেন আর বসে থাকতে পারল না। এক লাফে পুত্রের কাছে এসে দাঁড়াল। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আবূ জান্দালের গালে মারলো এক চড়।

আবূ জান্দালের গালে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ পড়ে গেল। সে চিৎকার করে উঠল ঃ উহ্, আল্লাহ্!

সুহায়েলের এরূপ আচরণ কারোই সহ্য হল না। মুসলমানগণ ভীষণ-ভাবে ক্ষেপে গেল। তাকে উচিত সাজা দেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

মহানবী (সা.) ইশারায় তাদের বসিয়ে দিলেন। কাউকে আক্রমণ না করার জন্যে নিষেধ করলেন।

সুহায়েল রাগে-দুঃখে তখনও থরথর করে কাঁপছে। সে চিৎকার করে বলল ঃ হে আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের কথা পাকা-পাকি হয়ে গেছে। সন্ধির শর্ত মুতাবিক আবূ জান্দালকে ফিরিয়ে দাও।

মহানবী (সা.)-এর মনে তখন নানান ভাবনা। অনেক দুশ্চিন্তা। আশ্রয়ের

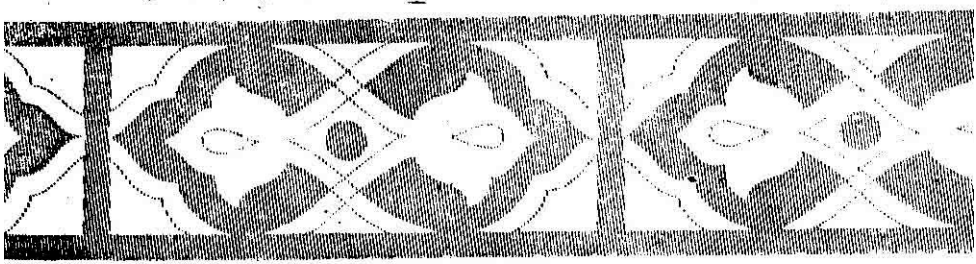

আশায় আবূ জান্দাল মুসলমানদের কাছে পালিয়ে এসেছে। এবার হাতে গেলে কাফিররা তাকে মেরেই ফেলবে। আবূ জান্দালকে আশ্রয় দেয়া তাঁর কর্তব্য। কিন্তু তিনি যে সন্ধির শর্ত মেনে নিয়েছেন। ওয়াদা করেছেন যে, মক্কার কোন মুসলমানকে আশ্রয় দিতে পারবেন না। কেউ পালিয়ে এলেও কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। তিনি কিভাবে তাঁর এই ওয়াদা ভঙ্গ করবেন।

তিনি তাই সুহায়েলকে অনুরোধ জানালেনঃ আবূ জান্দালকে আমি দান হিসাবে চাই।

সুহায়েল তাতে রাজী হল না।

তার এক কথা ঃ আবূ জান্দালকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

কাফিররা তাকে ধরে নিয়ে যাবে। মারধর করবে। তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করবে। আবূ জান্দাল আর ভাবতে পারে না। সে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে ঃ কত দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েই না আমি তোমাদের কাছে পৌঁছেছি। হায়! এখন কি করে দুশমনের কাছে ফিরে যাই!

কাফিররা আবূ জান্দালকে মারবে। গায়ে পাথর ছুঁড়বে। গলায় রশি লাগিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করবে। মহানবী (সা.) সব বোঝেন। অনুমান করতে পারেন। তবু তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারলেন না। আবূ জান্দালকে ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার মাথায় পিঠে হাত বুলালেন। সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ সবুর কর। ইনশাআল্লাহ্ তোমার জন্যে রাস্তা খুলে যাবে। তুমি মুক্তি পাবে।

সুহায়েল পুত্রকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দু'গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। তিনি আবূ জান্দালের চলার পথে তাকিয়ে রইলেন।

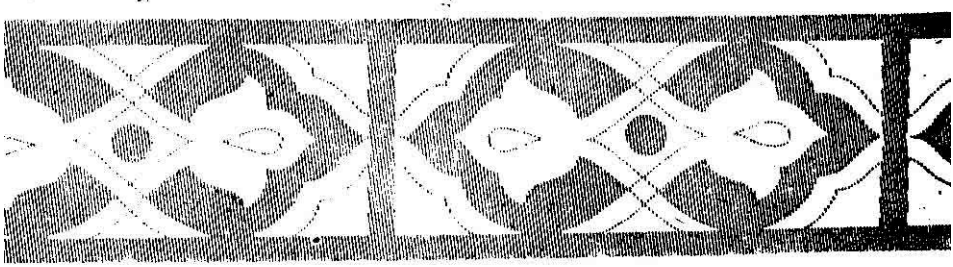

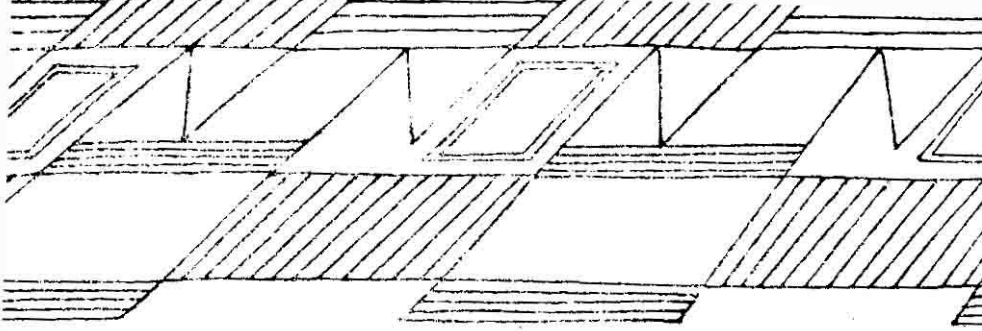

মায়া

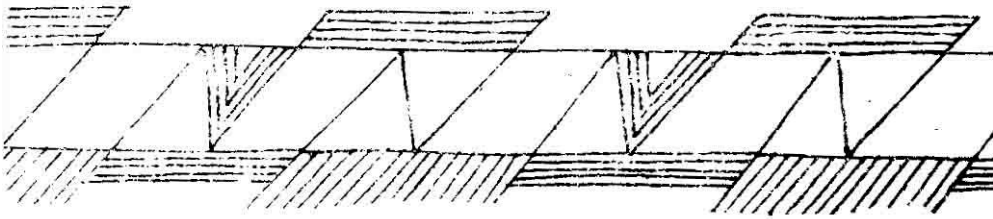

বেশ নিরিবিলি রাস্তা। লোকজনের তেমন চলাচল নেই। সেই পথ ধরেই হাঁটছেন নবীজী। রাস্তার উপর দিয়ে চলতে চলতে কিছু দূরে তিনি দেখতে পেলেন একটি উট। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। বেশ রোগাও। পিঠের উপর রাজ্যের বোঝা চাপানো। তার উপর চেপে বসে আছে একজন লোক। বোঝার ভারে উটটির পথ চলায় খুবই কষ্ট। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ধীর গতিতে চলছে।

উটচালকের পসন্দ হয় না এত ধীর গতিতে উটের পথ চলা। সে উটের পিঠে জোরে জোরে চাবুক মারতে থাকে। মারের চোটে উটের পিঠে

দাগ পড়ে যায়। কিন্তু চাবুক মারলে হবে কি, উটের গতি তো কোনক্রমেই আর বাড়ে না। সে শুধু অসহ্য যন্ত্রণায় ঘাড় নাড়তে থাকে। ছটফট করতে থাকে। চিৎকার করে যন্ত্রণা প্রকাশ করতে থাকে।

দূর থেকেই নবীজী এ দৃশ্য দেখছিলেন। উটের প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহারে তিনি ব্যথিত হলেন। তার পিঠে রাজ্যের বোঝা চাপানোকে তিনি মনে করলেন অপরাধ বলে।

নবীজী লোকটির কাছাকাছি হলেন। উটচালককে বললেন, তার উটটি তো বেশ রোগা। পিঠেও অনেক বোঝা চাপানো। কি করে সে তাড়াতাড়ি চলতে পারবে। আর কেনই বা অকারণে চাবুক মারা হচ্ছে তাকে।

নবীজী লোকটিকে উটটির উপর সদয় হবার উপদেশ দিলেন। তার মতো করে তাকে চলতে দিতে বললেন।

নবীজীর কথায় লোকটির ভুল ভাঙল। উটটিকে এভাবে কষ্ট দেয়ার জন্যে সে লজ্জিত হল। অনুতপ্ত হল মনে মনে। নেমে এল সে উটের পিঠ থেকে। চাবুক ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

পশু-পাখির প্রতিও নবীজীর এমনি মায়া ছিল।

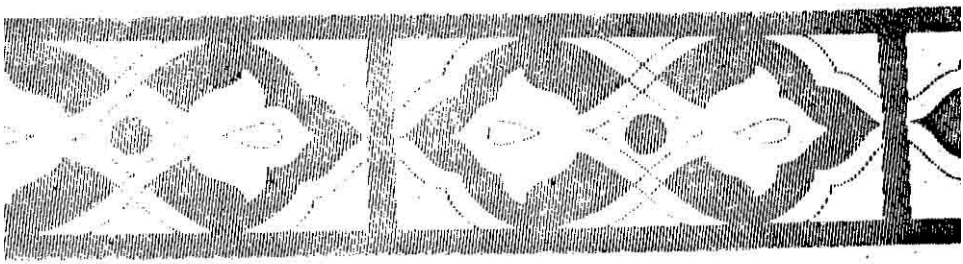

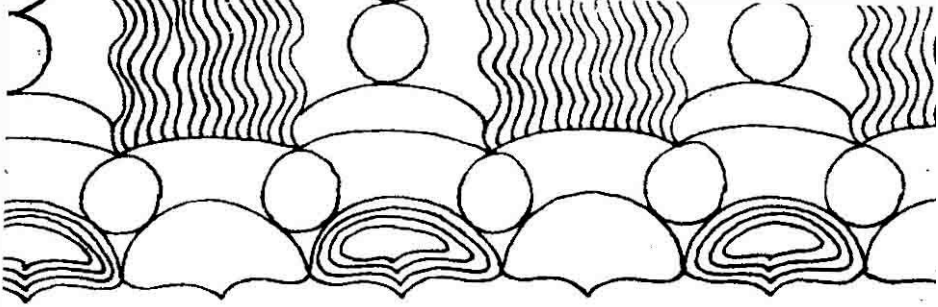

সম্মান

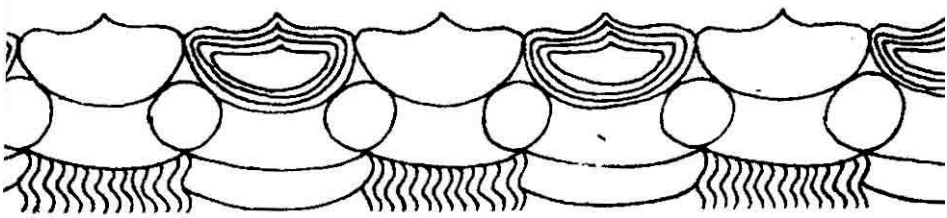

কে এই বুড়ি? কি তাঁর পরিচয়? কোথা থেকে এসেছেন তিনি? বুড়িকে নিয়ে সাহাবিগণের মনে তখন অনেক প্রশ্ন। অনেক ভাবনা তাঁরা ভাবছেন, আর ভাবছেন। কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না।

বুড়িকে আসতে দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা.) চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আলোচনা বন্ধ রেখে সোজা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। সাহাবিগণকে সরিয়ে পথ করে ধীর পায়ে দু'জনে হেঁটে এলেন মজলিসের ঠিক মাঝখানটায়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে বুড়িকে বসতে বললেন। বুড়িও কোন আপত্তি করলেন না। চাদরের উপর আরাম করে বসলেন। বুড়ির

পরনের কাপড়-চোপড় দেখতে খুব সাধারণ বলেই মনে হয়। কোন সাহাবীই তাঁকে চিনতে পারলেন না। কেউ কোনদিন দেখেছেন বলেও মনে করতে পারলেন না।

কিন্তু এই মহিলাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এত আদর-যত্ন করছেন কেন? তিনি তো সাধারণত কাউকে এমন করে খোশ আমদেদ জানান না। তা হলে কে এই বুড়ি, যাকে তিনি এত সম্মান দেখাচ্ছেন? দিচ্ছেন এত মর্যাদা। বুড়ি কি তাহলে অসাধারণ কেউ?

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বুড়ির সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছেন। কথা বলছেন খুবই আন্তরিকতার সাথে। অনেকদিন পর আপনজনকে দেখলে শিশুরা যেমন খুশি হয়, বুড়িকে দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা.)ও তেমনি খুশি হলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চোখে-মুখে আজ আনন্দের ছাপ।

মজলিসের সবাই চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। পাছে বেয়াদবি হয়, তাই কেউ কোন কথাও বলছেন না। নীরবে সবাই বসে রইলেন। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছেন ঘটনা।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

বুড়ি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা শেষ করলেন। তিনি চলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)ও বুড়ির সঙ্গে কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। কিছু উপহার-সামগ্রী দিলেন। তারপর হাসিমুখে তাঁকে বিদায় দিয়ে ফিরে এলেন সাহাবিগণের মাঝে।

সাহাবিগণ আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। বুড়ির পরিচয়

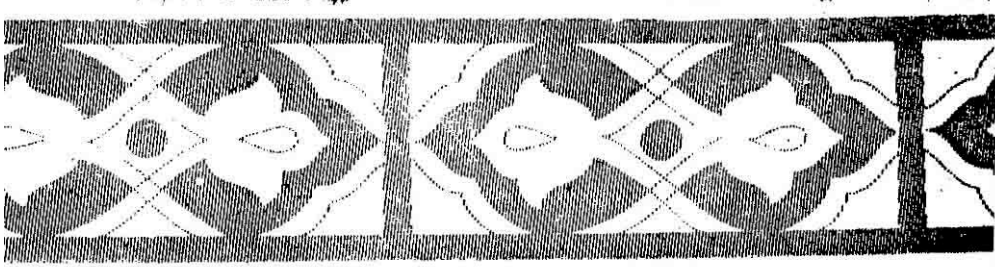

জানার জন্য তাদের ভীষণ আগ্রহের কথা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জানালেন। সাহাবিগণ বললেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! কে এই মহিলা? আপনি কেন তাঁকে এত শ্রদ্ধা জানালেন? এত সম্মান দেখালেন?

রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃদু হাসলেন। ধীরে ধীরে খুলে বললেন সব কথা। সাহাবিগণকে জানিয়ে দিলেন যে, ইনি তাঁর দুধমা হযরত বিবি হালিমা (রা.)। ছোটবেলা এই মহিলাই তাঁকে লালন-পালন করেছেন। এই মহিলার হাতেই তিনি বড় হয়েছেন। মায়েরা তাদের শিশু-সন্তানের জন্য যেমন কষ্ট করেন, এই মহিলাও তাঁর জন্য তেমনি কষ্ট করেছেন। অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন। আর সে জন্যই অন্যান্যের চেয়ে এই মহিলার সম্মান অনেক অনেক বেশি। মর্যাদাও অনেক উপরে।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ পিতা-মাতার প্রতি কখনও খারাপ ব্যবহার করো না। সব সময় তাঁদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলবে। তাঁদের প্রতি খুবই বিনয়ী থাকবে। কারণ, তাঁদের খুশিতে আল্লাহ্ খুশি হন; তাঁরা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ্ও অসন্তুষ্ট হন।

রসূলের এই কথা শুনে সাহাবিগণের অন্তর মায়ের প্রতি দরদে নতুন করে আলোকিত হল। তাঁরা যেন পিতা-মাতাকে নতুন করে চিনতে পারলেন।

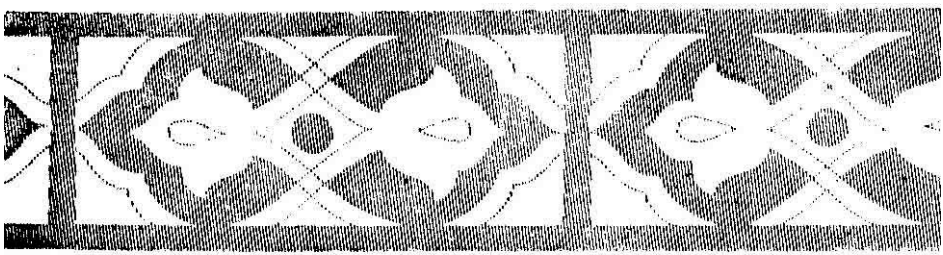

রসূল করীম (সা.) খুব সহজ-সরল জীবন কাটাতেন। কোন রকম বিলাসিতা তিনি পছন্দ করতেন না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন আসবাবপত্রও ঘরে রাখতেন না। সাধারণভাবে জীবনযাপনের জন্যে যতটুক প্রয়োজন, তা' নিয়েই তিনি খুশি থাকতেন।

উমর (রা.) বিন খাত্তাবের বর্ণনা থেকেই এর নজির মেলে।

হঠাৎ একদিন রসূলের সংগে দেখা করা জরুরী হয়ে পড়ল। উমর (রা.) বিন খাত্তাব রসূল (সা.)-কে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও পেলেন না। অবশেষে তিনি সোজা গিয়ে হাজির হলেন রসূলের বাড়িতে।

রসূল (সা.) তখন বাড়িতেই ছিলেন। উমর (রা.) বিন খাত্তাবকে তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। আদর-যত্ন করে নিজের কাছে বসতে দিলেন।

রসূলের গায়ে তখন একটিমাত্র চাদর। ঘরে ছিল একটি খাটিয়া। একটি বালিশ ছাড়া খাটিয়ায় কোন বিছানাপত্র নেই। তাও আবার খেজুরের পাতার তৈরি। এক কোণে রয়েছে একটি পাত্র। পাত্রে সামান্য কিছু আটা। আর এক কোণে রয়েছে একটি পশুর চামড়া ও পানি টানার কয়েকটি ভিস্তি।

রসূল (সা.)-এর বাড়িতে উমর (রা.) বিন খাত্তাব এসেছেন এই প্রথম। তিনি ঘরের এদিকে-ওদিকে তাকালেন। কিন্তু অতিরিক্ত আর কিছুই দেখতে পেলেন না। রসূলের ঘরে এত সামান্য জিনিস দেখে তিনি অবাক হলেন।

উমর (রা.) বিন খাত্তাবের মনে তখন নানান প্রশ্ন। তাঁর ঘরে এত সামান্য জিনিস কেন? কেন তিনি এত কষ্ট করবেন? কিসের অভাব তাঁর? খালি বিছানায় ঘুমোতে গিয়ে রসূলের পিঠে দাগ পড়বে—এ কেমন কথা? ঘরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য উপায়-উপকরণের দিক দিয়ে তিনি তৃপ্তিতে জীবন কাটাতে পারবেন না,—এ কেমন করে হয়?

উমর (রা.) বিন খাত্তাব আর ভাবতে পারলেন না। রসূলের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে তাঁর মনটা ভারী হয়ে এল। রসূলের চোখে তা' ধরা পড়ল। রসূল (সা.) বললেন ঃ উমর! কি হয়েছে তোমার?

উমর (রা.) বিন খাত্তাব বললেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা.)! আপনার খাটিয়ায় কোন বিছানা নেই। শূন্য বিছানায় শুয়ে আপনার পিঠে দাগ পড়ে গেছে। আপনার গৃহের আসবাবপত্র খুবই সামান্য। প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসই

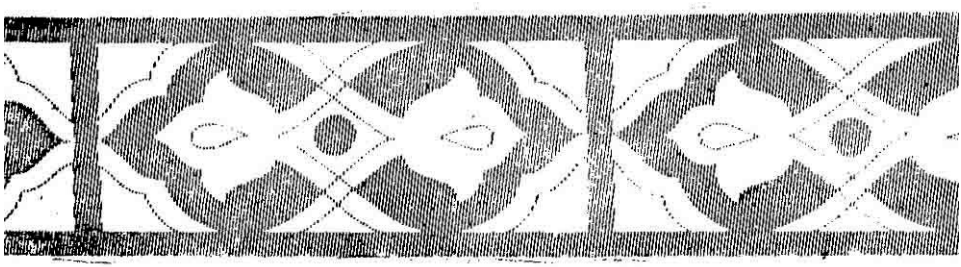

আপনার নেই। আপনার গৃহখানিও একটু ভালোভাবে বাসের অনুপযোগী। পারস্যের সম্রাট ও রোমের রাজারা অমুসলিম। অথচ কত সুখ-শান্তি তাদের! জিনিসপত্রের কোন অভাব নেই। আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। অথচ আপনার এ সব কিছুই নেই। কিসের অভাব আপনার? আপনি কেন এমন দুঃখ-কষ্টে ভরা সাধারণ জীবন যাপন করবেন?

রসূল (সা.) মৃদু হাসলেন। বললেনঃ তুমি যাদের কথা বলছ, তারা অনেক আরাম-আয়েশের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অনেক সুখ-শান্তি তাদের। কিন্তু তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, তারা শুধু এই পৃথিবীর জীবন ভোগ করবে আর আমরা ভোগ করব পরকালের অনন্ত শান্তি সুখ!

উমর (রা.) বিন খাত্তাব নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। মহানবীর কাছে তিনি নতুন শিক্ষা পেলেন। দুনিয়াতে আরাম-আয়েশে সময় না কাটাবার মহান প্রেরণা নিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

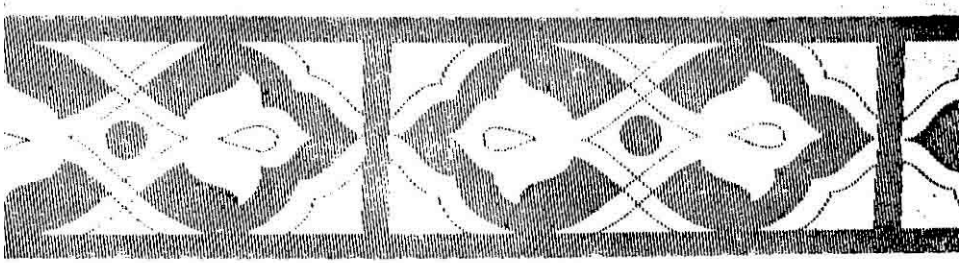

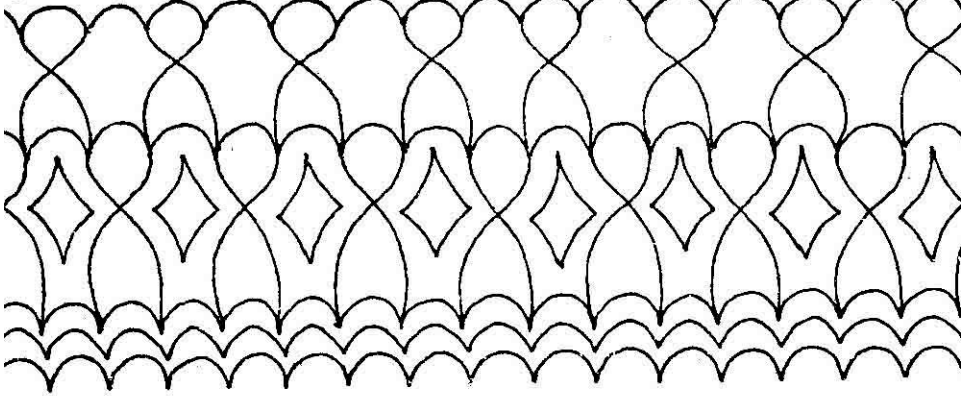

দায়িত্ব

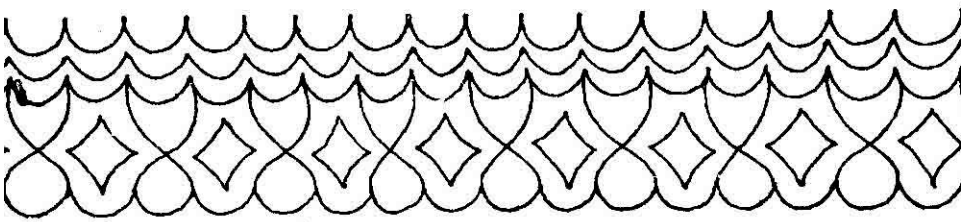

বদরের যুদ্ধ গেল। ওহুদের যুদ্ধ গেল। কিন্তু কাফিররা মুসলমানদের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারল না। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবূ সুফিয়ানের মাথায় আবার দুষ্ট-বুদ্ধি চেপে বসল। রাতদিন খেটে সে বিরাট সৈন্য বাহিনী সাজাল। তারা মদীনা আক্রমণ করার জন্য তৈরি।

আবূ সুফিয়ানের এই ষড়যন্ত্রের কথা মুসলমানদের কাছে ফাঁস হয়ে গেল। মহানবী (সা.) সবাইকে নিয়ে পরামর্শসভা ডাকলেন। যুদ্ধের কৌশল ও প্রস্তুতি নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হল। ঠিক হল, মুসলমানগণ মদীনায় থেকেই যুদ্ধ করবে। প্রস্তুতি হিসেবে মদীনার চারপাশে এবার পরিখা খনন করা হবে।

পরিখা খননের কাজ শুরু হল। মহানবী (সা.) নির্দেশ দিলেন, মুসলমানগণ প্রতি দশজনে মিলে একটি দল গঠন করবে। কোন্ দল কতটুকু মাটি কাটবে, তা প্রথম থেকেই ঠিক করে নিতে হবে।

কোন হৈ-চৈ হট্টগোল নেই। যেমন নির্দেশ তেমন কাজ। সকলে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ শুরু করল। মহানবী (সা.) ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন।

তিনি ঘুরতে ঘুরতে হযরত বিলাল (রা.)-এর কাছে এসে হাজির। বিলাল (রা.)-কে বললেন, বিলাল! তোমার দলে কয়জন?

জবাব এল ঃ নয়জন।

মহানবী (সা.) বললেন ঃ ঠিক আছে। আমাকে তোমার দলে নিয়ে নাও। তা'হলে তোমরাও দশজন হবে।

হযরত বিলাল (রা.) ভাবলেন, এ কেমন কথা! তিনি আমাদের নেতা। আমরা থাকতে তিনি কেন এ-কাজ করতে আসবেন?

তিনি রসূলুল্লাহ্‌র প্রস্তাবে অসম্মতি জানালেন। বললেন ঃ না, তা কি করে হয়?

মহানবী (সা.) কিন্তু নাছোড়বান্দা। সবাই মাটি কাটবে, কাজ করবে আর তিনি বসে থাকবেন, কোন কাজ করবেন না, নিজের দায়িত্ব পালন করবেন না, এটা তো ঠিক না। এতে যে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন। তাই তিনি বিলাল (রা.)-কে বারবার অনুরোধ করলেন।

অবশেষে বিলাল (রা.) মহানবী (সা.)-কে তাঁর দলে নিলেন। মহানবী (সা.) অন্যদের সঙ্গে একই কাতারে দাঁড়িয়ে মাটি কাটবেন।

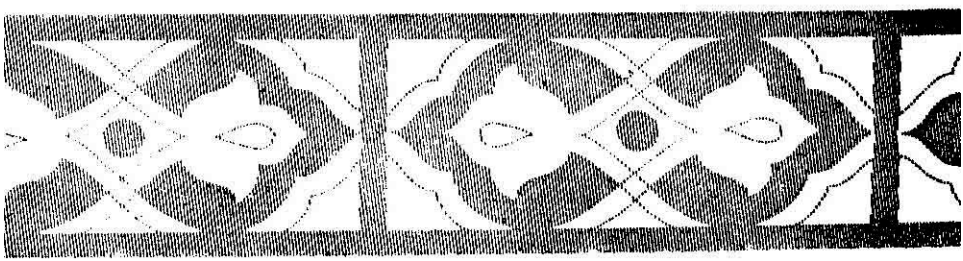

বিলাল (রা.) রসূলের মাথায় এক টুকরি মাটি তুলে দিলেন। টুকরি মাথায় নিয়ে মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেনঃ আরও এক টুকরি দাও।

বিলাল (রা.) নিয়মের বাইরে যেতে রাজি হলেন না। তিনি বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কেন দু'টুকরি নেবেন? সবাই তো এক টুকরি করে নিচ্ছে।

বিলাল (রা.)-এর কথায় মহানবী (সা.) মৃদু হাসলেন। বললেনঃ হে বিলাল! আমি তোমাদের মতই মানুষ। সে হিসাবে এক টুকরি নিয়েছি। কিন্তু আমার উপর রয়েছে নবীর দায়িত্ব ও নেতার দায়িত্ব। তাই আমাকে বোঝাও বেশি নিতে হবে।

বিলাল (রা.) আর কি করেন! জবাবে তিনি কোন কথাই খুঁজে পেলেন না। আর এক টুকরি মাটি রসূলুল্লাহ্‌র মাথায় তুলে দিলেন।

এক সঙ্গে দু'টুকরি মাটি মাথায় নিয়ে হেঁটে চললেন মহানবী (সা.)।

আমাদের প্রিয় নবী অহংকার কাকে বলে জানতেন না। তিনি ভাবতেন, যিনি নেতা, যার পদমর্যাদা বেশি, তাকে কাজও করতে হবে বেশি।

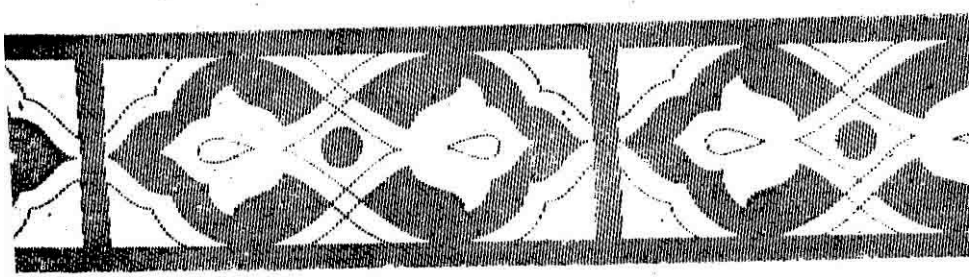

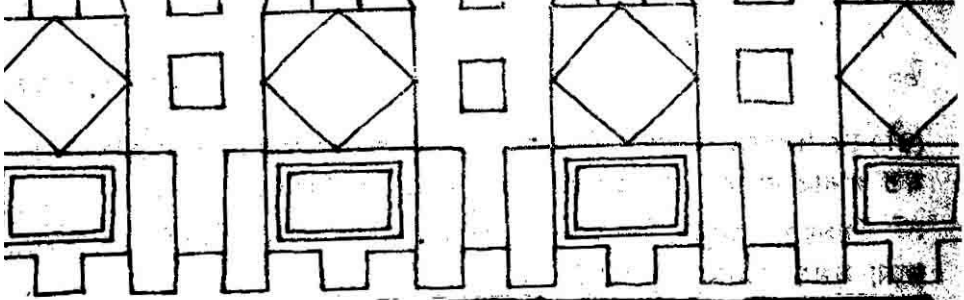

ব্যবহার

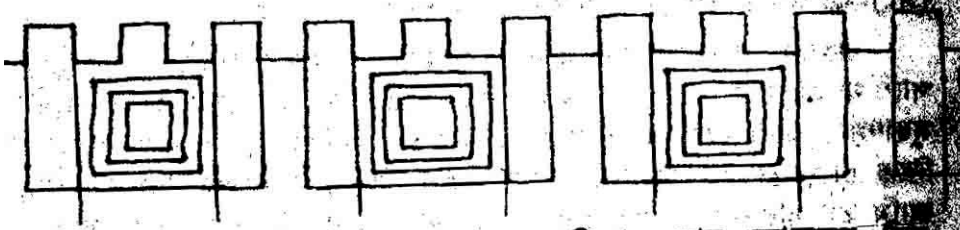

ইমামা অঞ্চলের একটি গোত্রের নাম বনু হানিফা। তার লোকজন ছিল মুসলমানের বড় শত্রু। সব সময় তারা মুসলমানদের বিরোধিতা করত। নানা ভাবে মুসলমানগণের উপর জোর-জুলুম করত। সুযোগ পেলেই মুসলমানদের হত্যা করত।

সামামা এই গোত্রের প্রধান। সে ছিল খুবই নিষ্ঠুর।

মুসলমানগণ একবার সামামাকে বন্দী করে। তাকে নিয়ে আসে মদীনায়। রসূল (সা.) সামামাকে মসজিদের একটি থামের সঙ্গে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিলেন। সাহাবিগণকে বললেনঃ তোমরা সামামার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।

সামামা ছিল খুবই পেটুক। এক বৈঠকে সে দশজনের খাবার একাই খেতে পারত। রসূল (সা.) তা জানতেন। তিনি বাড়িতে গিয়ে হযরত আয়েশা

(রা.)-কে বললেন ঃ আজ আমরা একজন পেটুক মেহমানকে পেয়েছি। ঘরে যত খাবার আছে, তা' মেহমানের জন্য একত্র করে রাখ।

হযরত আয়েশা (রা.) কোন আপত্তি করলেন না। বন্দী মেহমানের জন্যে সমস্ত খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

সামামাও কম নয়। যা কিছু পাঠান হল, সবটাই সে খেয়ে নিল। এ দিকে রসূলের ঘরেও কোন খাবার নেই। ফল যা হবার তাই হল। রসূল (সা.)-এর পরিবারকে সে রাতের মত অনাহারে কাটাতে হল।

এভাবে চলল বেশ কয়েকদিন। সামামা খায় দায় ঘুমায়। তার চার-পাশে যা ঘটছে, তা' ভালভাবে লক্ষ্য করে। রসূলের সঙ্গে দেখা হলেই বলে ঃ মুহাম্মদ, আমি তোমার অনেক লোক হত্যা করেছি। যদি তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও, তা'হলে আমাকে হত্যা কর। যদি তুমি মুক্তিপণ নির্ধারণ কর, আমি তা' পরিশোধ করতে দেরি করব না। আর যদি ক্ষমা কর, তা'হলে আমাকে একজন কৃতজ্ঞ লোক হিসেবে পাবে।

রসূল (সা.) সামামার কথার কোন জবাব দেন না। তাকে ভালমন্দ কিছুই বলেন না।

অবশেষে একদিন তিনি সামামার বাঁধন খুলে দিলেন। তাকে মুক্ত বলে ঘোষণা করলেন।

সামামা নিজ বাড়ির পথে পা বাড়াল

সামামা শত্রুর কবল থেকে ছাড়া পেয়েছে। চলে যাচ্ছে সে। কিন্তু তবুও তার সন্দেহ দূর হতে চায় না। বার কয়েক পেছন ফিরে তাকাল সে। না, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। সে এখন মুক্ত, স্বাধীন। হঠাৎ সামামার মনে হল—তার পা যেন অবশ হয়ে আসছে। সে আর চলতে পারছে না। সে একটি গাছের নীচে দাঁড়াল। এক সময়ে বসে পড়ল মাটিতে।

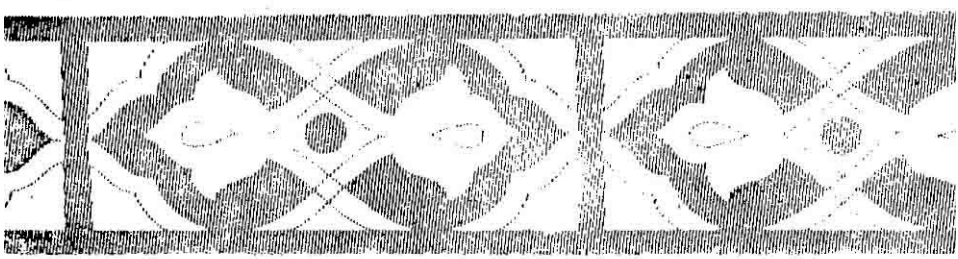

সামামার মনে তখন অনেক ভাবনা। অনেক কল্পনা। সে মুসলমানদের কিরূপ অত্যাচার করেছে, কিভাবে সে বন্দী হয়েছে, মুসলমানগণ তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছে—এমনি অনেক কিছু। নিজের অজান্তেই সে রসূলের প্রতি কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ল। রসূলের উদারতার কথা স্মরণ করে তার মনে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হল। সে আর স্থির থাকতে পারল না। সোজা চলে এল রসূলের দরবারে। জোড় হাতে অতীতের কাজের জন্য ক্ষমা চাইল। ইসলাম কবুল করল।

দিন কয়েক পরের ঘটনা।

সামামা মক্কায় এলেন বেড়াতে। তাঁর শখ হল, কা'বা ঘরে যাবেন। কা'বা ঘরের চত্বরে চিৎকার করে বললেনঃ আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আহাদুন। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ এক।

মক্কার কাফিরেরা সামামার এই ঘোষণা বরদাশত করল না। সদলবলে তারা ছুটে এল খোলা তরবারি হাতে। সামামাকে অপমান করল। খুব করে গালমন্দ করল।

সামামা তাদের সঙ্গে কোন বাড়াবাড়ি করলেন না। মনে মনে ভীষণভাবে ক্ষেপে গেলেন। ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। যে করেই হোক এর প্রতিশোধ নিতে হবে। সামামা মক্কাবাসীদের কাবু করার ফন্দি-ফিকির খুঁজতে লাগলেন।

সামামা ছিলেন ইমামা অঞ্চলের লোক। এ অঞ্চল হতেই মক্কাবাসীরা খাবারের জিনিস আমদানী করত। যে বছর এ অঞ্চলে ভাল ফসল হত, সে বছর মক্কার লোকেরাও আরামে থাকত। আর ফসল ভাল না হলে, তাদেরও

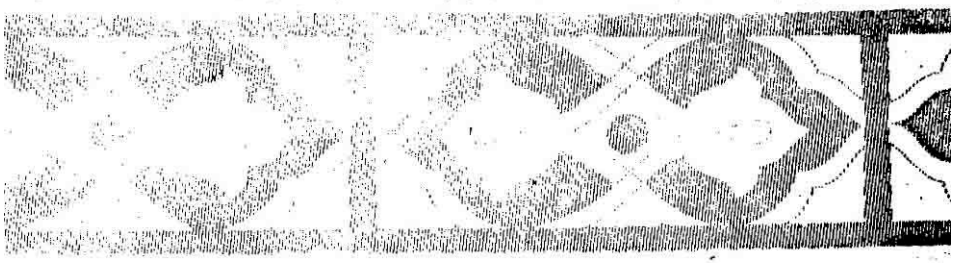

কষ্টে দিন কাটত। সামামা ভাবলেন—পথ পেয়ে গেছি। এবার তারা কাবু না হয়ে যায় কোথায়। মক্কা শহরে খাদ্যশস্য পাঠান বন্ধ করে দিতে হবে। তা'হলেই বাছারা মজা টের পাবে।

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। কথা নেই বার্তা নেই, সামামা হঠাৎ একদিন মক্কা শহরে খাদ্যশস্য পাঠান বন্ধ করে দিল।

মক্কার লোকেরা এবার পড়ল ভীষণ বিপদে। দিন যায়, সপ্তাহ যায়। ইমামা অঞ্চল হতে কোন খাবার আসে না। এদিকে কোন রকমে সামামার সঙ্গেও আপস করা যায় না। তাঁর একই কথা—মক্কায় কোন খাদ্যশস্য পাঠান হবে না।

দিনে দিনে অবস্থা চরমে উঠল। মক্কাবাসীদের না খেয়ে মরার যোগাড় হল।

কাফির সরদারেরা পরামর্শসভায় বসল। অনেক আলাপ-আলোচনা হল। সামামার সঙ্গে আপস করার কোন পথ পাওয়া গেল না। সরদারেরা হতাশ হয়ে পড়ল।

এরি মধ্যে একজন বলল ঃ মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয় খুবই কোমল। অন্যের দুঃখ-কষ্ট, কোন রকম অন্যায়-অবিচার তিনি সহ্য করতে পারেন না। আমার মনে হয়, মুহাম্মদ (সা.)ই এর সমাধান করে দিতে পারবেন।

আরেকজন বলল ঃ সামামা মুসলমান হয়েছে। নিশ্চয়ই সে মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করতে পারবে না।

কাফির সরদারেরা নিরুপায়। কোন পথ তাদের সামনে খোলা নেই। লজ্জা-শরম বাদ দিয়ে তারা হাজির হল মহানবী (সা.)-এর দরবারে। অনুনয়-

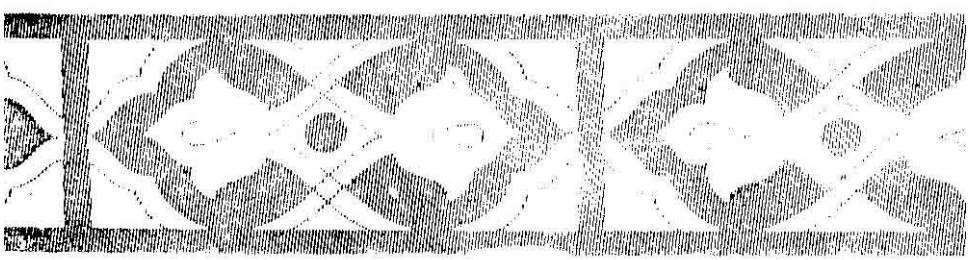

বিনয় করে বলল ঃ হে মুহাম্মদ, আমরা বড়ই বিপদে আছি। সামামা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। মক্কায় খাদ্যশস্য পাঠান বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা তোমার আত্মীয়-স্বজন। তুমি কি আমাদের না খাইয়ে মারতে চাও?

মক্কাবাসীরা ছিল মুসলমানদের জীবনের শত্রু। মহানবী (সা.)-কে তারা কত নির্যাতন করেছে। হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। তবু তিনি তাদের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না। তারা না খেয়ে কষ্ট পাবে—রসূলের তা' ভাল লাগল না। তিনি সামামাকে জানিয়ে দিলেন, খাদ্য-শস্য আল্লাহ্‌র দান। এর উপর সকলের জন্মগত অধিকার রয়েছে। খাবার নিয়ে কখনও শত্রুতা করা উচিত নয়। একদিকে লোক না খেয়ে থাকবে, অভাব-অনটনে কষ্ট পাবে, আর অন্যদিকে খাদ্য-শস্য জমা হবে, সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠবে ;—আল্লাহ্ তা পসন্দ করেন না।

তিনি সামামাকে বিধি-নিষেধ তুলে নিতে বললেন। ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন। মক্কায় খাবার সরবরাহের নির্দেশ দিলেন।

সামামা আর কি করেন! কি করে তিনি রসূলের নির্দেশ, আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করেন! সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মক্কায় খাদ্য-শস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন।

রসূল (সা.)-এর অনুগ্রহের ফলে মক্কাবাসীরা দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রেহাই পেল। তবু মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা কমল না। গোপন ষড়যন্ত্রও থামল না।

রসূল (সা.) এসব কিছুই জানতেন, বুঝতেন। তবু তিনি কাউকে না খাইয়ে রাখা, কোন রকম কষ্ট দেয়া পসন্দ করতেন না। শত্রুর প্রতি দায়িত্ব পালনেও কখনও পিছপা হতেন না।

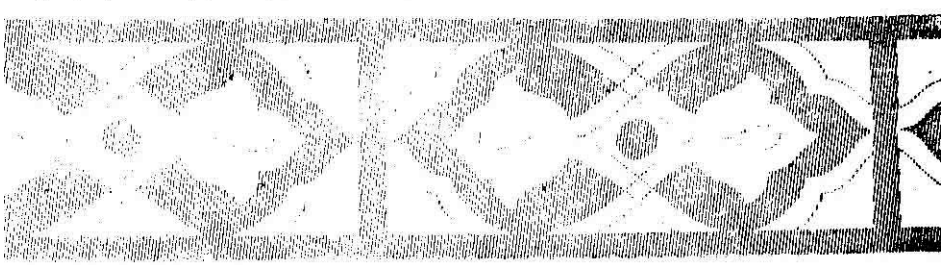

অপরাধ

বালকটি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির। এখানে-ওখানে ঘোরাফেরা করল অনেক। কিন্তু কোথাও খাবার পেল না।

কোথায়ই বা পাবে?

মদীনায় তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ। যাদের অবস্থা ভাল, কিছুটা খেয়ে-দেয়ে তাদেরই কোনরকমে দিন কাটে। কিন্তু যারা গরীব, যাদের কিছুই নেই, তাদেরই হল সমস্যা। একমুঠো খাবারের আশায় তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। অনেকেরই দিন কাটে অনাহারে, অর্ধাহারে।

বালকটি রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। চোখ বড় বড় করে এদিক-ওদিক খাবার খুঁজছে। ক্ষুধার জ্বালা সে আর সইতে পারছে না।

অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে সে এসে হাজির হল মহানবী (সা.)-এর দরবারে। মহানবী (সা.)-এর কাছে বাগানের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। সব কথা খুলে বলল।

মহানবী (সা.) সব শুনলেন। অন্তরে ব্যথা পেলেন। ভাবলেন, তাইতো! এতটুকু ছেলে! ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে সে বাগানের দুটো ফল খেয়েছে। এ জন্যে কি তাকে প্রহার করতে হবে? এ জন্যে কি তার জামা-কাপড় খুলে রাখতে হবে?

মহানবী (সা.) বাগানের মালিককে ডেকে পাঠালেন। বললেন ঃ তোমার এতবড় বাগান! এত ফলমূল সেখানে! ক্ষুধার্ত বালক বাগান থেকে দু'টো ফল কুড়িতে খেয়েছে। তাতে তোমার কি এমন ক্ষতি হয়েছে? ক্ষুধার্তজনের মুখে খাবার তুলে দেয়া তোমারই তো উচিত। আল্লাহ্ তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন। শান্তি দিয়েছেন। তাই বলে অন্যের উপর অত্যাচার কর না, জুলুম কর না।

মহানবী (সা.)-এর কথা শুনে বাগানের মালিক লজ্জিত হল। সে বুঝতে পারল, ক্ষুধার্তকে খাবার না দিয়ে, অসহায়ের প্রতি দরদ না দেখিয়ে সে বিরাট অপরাধ করেছে।

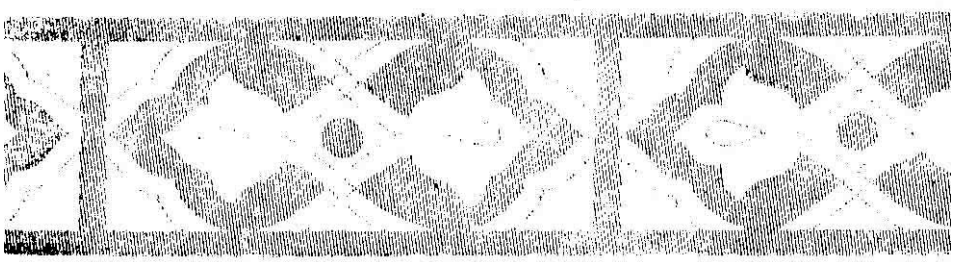

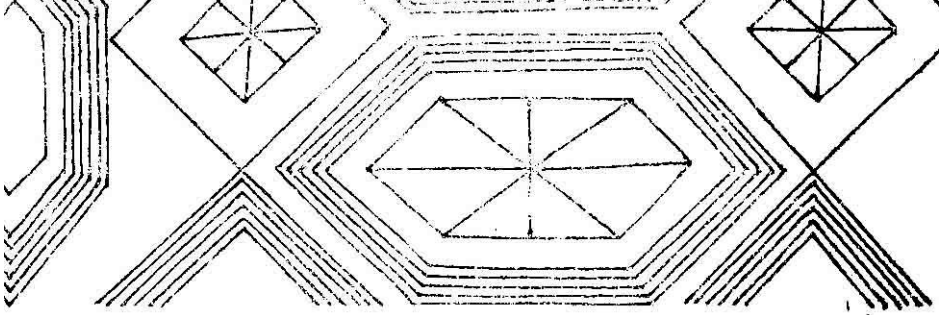

সবার জন্যে

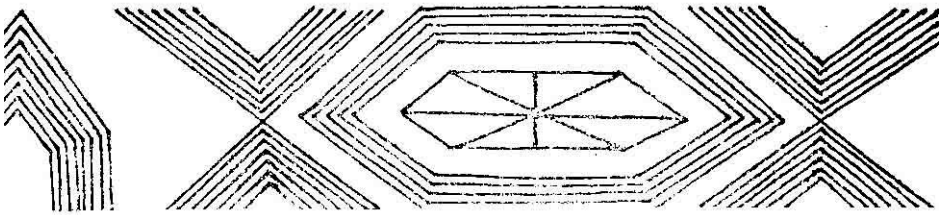

বছর ঘুরে আবার এসেছে ঈদ। সবাই যেন খুশিতে মাতোয়ারা।

সবাই ভাল জামা-কাপড় পরেছে। আতর-খোশবু লাগিয়েছে। দল বেঁধে হেঁটে চলেছে ঈদের জামাতে। শিশু-কিশোররাও বসে নেই। তারাও পথ চলেছে মুরুব্বিদের সাথে।

সারা মদীনায় যেন নেমে এসেছে আনন্দের ঢল। মন ভার করে নেই কেউ। সবার মুখেই হাসি। আনন্দ।

ঈদের নামায শেষ হয়ে গেছে। এবার ঘরে ফেরার পালা। নবীজীও বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছেন। পথ চলছেন আর দেখছেন শিশুদের প্রাণখোলা আনন্দ।

পথ চলতে চলতে তিনি একটি শিশুকে দেখতে পেলেন। শিশুটি রাস্তার ধারে বসে আছে। গায়ে ময়ল-নোংরা জামা-কাপড়। দেখতে একেবারে রোগা। সে কাঁদছে।

ছেলেটির অসহায় অবস্থা দেখে নবীজী মনে ব্যথা পেলেন। আজ ঈদ। খুশির দিন। সব শিশুরাই আনন্দ-উল্লাসে মেতে রয়েছে। কিন্তু এই শিশুটি একাকী বসে আছে কেন? কেন সে কাঁদছে? কিসের অভাব তার?

নবীজী দ্রুত পায়ে শিশুটির কাছে গেলেন। তার কাঁধে হাত রাখলেন। মোলায়েম কণ্ঠে বললেন: তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

ছেলেটির মনে তখন অনেক দুঃখ। অনেক ব্যথা। নবীজীর এমন শান্ত কণ্ঠে সে আরও বেদনাহত হল।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে তার মনের সব কথা খুলে বলল: মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে এক জিহাদে গিয়ে আমার আব্বা মারা গেছেন। আম্মার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে। আমার বিষয়-সম্পত্তি অন্যরা দখল করে নিয়েছে। আজ ঈদ। খুশির দিন। সকল শিশুই আজ ভাল জামা-কাপড় পরেছে। মনের আনন্দে হাসি-খুশিতে মেতে উঠেছে। অথচ আমার খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই, থাকার জায়গা নেই।

ছেলেটির দুঃখের কথা শুনতে শুনতে নবীজীও কেঁদে ফেললেন। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। ম্লান হাসি হাসলেন। শিশুটিকে সান্ত্বনা দিয়ে

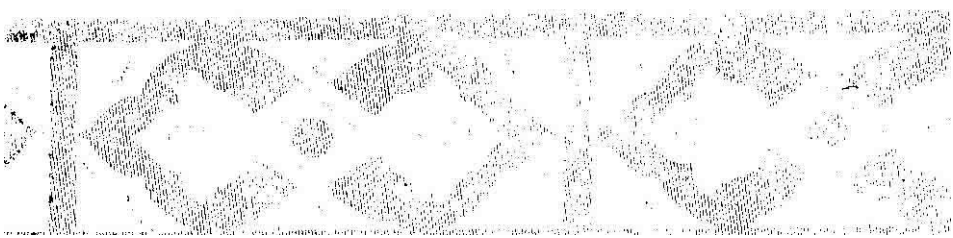

বললেন ঃ তাতে হয়েছে কি? বাবা-মা নেই বলেই কি কাঁদতে হবে? ছোট বেলা আমিও আমার বাবা-মাকে হারিয়েছি।

নবীজীর কথা ছেলেটির মনে দাগ কাটল। ছেলেটি ভাবল, লোকটিও কি আমার মত দুঃখী! সে মুখ তুলে তাকাল। লোকটিকে দেখে সে তো একেবারে হতবাক। সে ভাবতেও পারেনি যে, সে এতক্ষণ নবীজীর সঙ্গেই কথা বলেছে। সে কোন কথা বলতে পারল না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নবীজীর স্নেহভরা মুখের দিকে।

নবীজী বললেন ঃ এক কাজ কর। আচ্ছা, আমি যদি তোমার পিতা, আমার স্ত্রী তোমার মা, আর আমার কন্যা ফাতিমা তোমার বোন হয়, আর তুমি আমাদের সঙ্গেই থাক; তা'হলে কি তুমি খুশি হবে?

নবীজীর কথা শুনে ছেলেটি চমকে উঠল; তাহলে সেও বাবা-মা বলে ডাকতে পারবে? বোনের সঙ্গে খেলতে পারবে? খুশিতে তার মন ভরে উঠল। মাথা নেড়ে বলল ঃ হ্যাঁ।

নবীজী এতিম ছেলেটিকে নিয়ে সোজা বাড়ি চলে গেলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-কে ডেকে বললেন ঃ এই দেখ, তোমার জন্যে একটি ছেলে নিয়ে এসেছি।

হযরত আয়েশা (রা.) নিজ হাতে ছেলেটিকে গোসল করালেন, খাওয়ালেন, ভাল জামা-কাপড় পরালেন। বললেন ঃ এবার যাও, অন্যদের সাথে খেলা কর। আনন্দ কর। খেলা শেষে আবার ফিরে এস।

অন্য শিশুরা তার এমন সুন্দর জামা-কাপড়, সাজগোজ দেখে অবাক হল।

ঈদের আনন্দে সেও শরিক হলো।

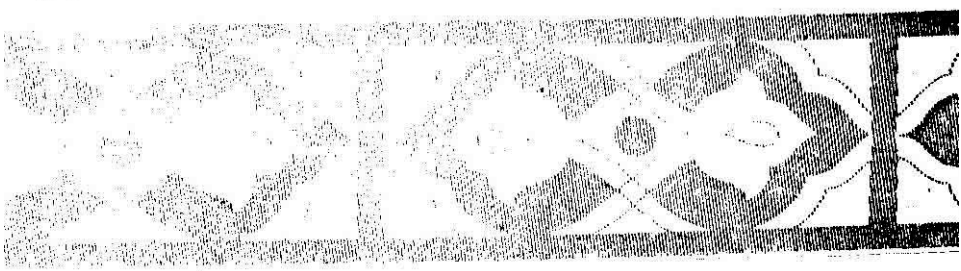

আড়ম্বর নয়

নবীজী দীর্ঘ সময় সফরে কাটালেন। সফর শেষে ফিরে এলেন মদীনায়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, পরিচিত জনদের দেখার জন্যে তাঁর মন ব্যাকুল। পথে-ঘাটে যার সঙ্গে দেখা হয় তার কুশল কামনা করেন। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন। কারো মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। কারো সঙ্গে হাত মিলান।

পথ চলতে চলতে তিনি এ-ঘরে সে-ঘরে গেলেন। সবার সঙ্গে দেখা করলেন। অবশেষে এসে উপস্থিত হলেন কন্যা ফাতিমার বাড়িতে।

দীর্ঘ সময় পর বাবা আর মেয়ের দেখা হবে। নবীজীর সে কি আনন্দ!

কিন্তু ঘরের দরজায় এসেই নবীজী থমকে দাঁড়ান। দরজায় রঙিন পর্দা ঝুলছে। বেশ একটু ছিম-ছাম গোছের ঘর-দুয়ার। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ের হাতে এক জোড়া রূপার বালা।

নবীজী কোন কথা বললেন না। মুখখানা তাঁর ভার হয়ে এল। মেয়ের এত সাজগোজ তাঁর পসন্দ হল না। যে পথে তিনি এসেছিলেন সে পথেই ফিরে গেলেন।

নবীজী ভালভাবেই জানেন যে, দেশে এমন অনেক লোক আছেন যাদের পরনে কাপড় নেই। অনেকেরই দু'বেলা খাবার জোটে না। এই যখন অবস্থা, তখন নবী-কন্যা রঙিন পর্দা আর রূপার বালা ব্যবহার করেন কিভাবে ?

ফাতিমা (রা.) পিতাকে দেখার জন্যে গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। সফরের পর পিতার হাসি-খুশি মুখ দেখবেন, তাঁকে আদর-যত্ন করবেন, সফরের কাহিনী শুনবেন—এই ছিল তাঁর মনের আশা। কিন্তু—কোন কথা না বলে পিতা এভাবে চলে গেলেন কেন? আমি কোন অন্যায় করিনি তো। কোন্ দোষে পিতা এভাবে ফিরে গেলেন? তিনি তো কখনও এমনটি করেন না।

তাঁর মুখের হাসি, মনের আনন্দ মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল। নীরবে কেঁদে ফেললেন তিনি।

আবু রাফে ছিলেন নবীজীর একজন অনুগত সহচর। ইতিমধ্যে তিনি নবীজীর নিকট থেকে সব কথা শুনে নিয়েছেন। তিনি ভাবলেন—হযরত

ফাতিমা (রা.)-কে খবরটা পৌঁছে দেয়া উচিত। ছুটে এলেন তিনি ফাতিমার কাছে। ফাতিমা (রা.)-কে বললেন ঃ দরজার রঙিন পর্দা ও হাতে রূপার বালা দেখে নবীজী অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই তিনি কথা না বলে ফিরে গেছেন।

ফাতিমা (রা.) বুঝলেন যে, অন্যকে দুঃখ-কষ্টে রেখে কখনও সম্পদ ভোগ করা যায় না। অপরের দুঃখ দূর না করে সুখ ভোগ করলে অন্যায় হয়।

হযরত ফাতিমা (রা.) আর দেরি করলেন না। রঙিন পর্দা ও রূপার বালা খুলে ফেললেন। তাঁর চোখে মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। খুশি মনে জিনিসগুলো তুলে দিলেন আবূ রাফে'র হাতে। বললেন ঃ আব্বাজীকে এগুলো দিয়ে দিও। তিনি যেন এগুলো বিলিয়ে দেন।

হযরত ফাতিমার এমন আচরণে নবীজী খুব খুশি হলেন। তিনি সে সব বিক্রি করে দিলেন। যে অর্থ পেলেন, তা দিয়ে দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়া হল।

সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন ছিল নবীজীর।

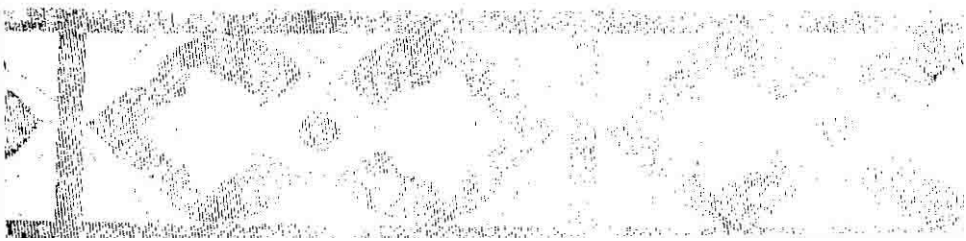

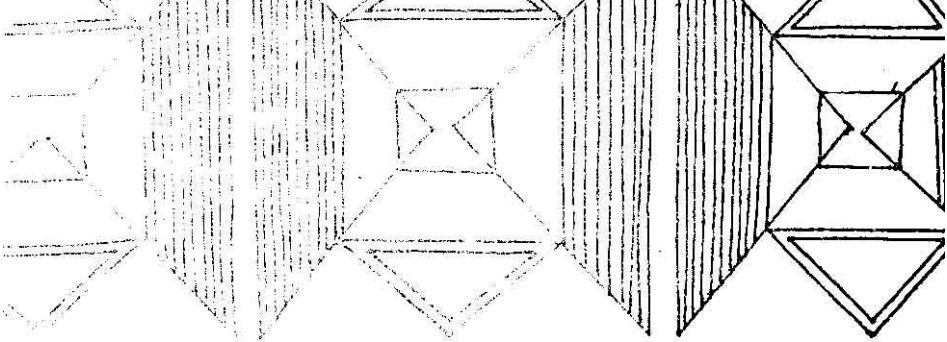

সততার শপথ

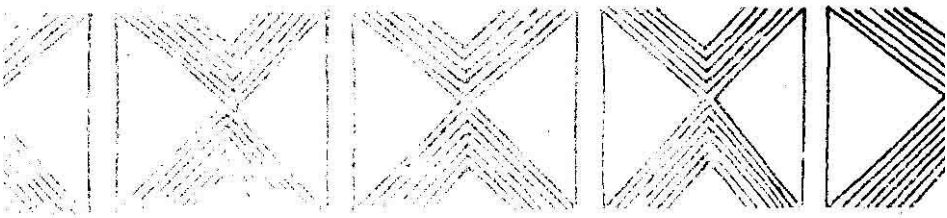

জীবিকা অর্জনের জন্যে চাই কাজ। সৎ পথে থেকে, কারো উপর জুলুম অত্যাচার না করে যে কাজ করা যায় তা-ই মহৎ। তা-ই ন্যায়সঙ্গত।

জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবসা বেশ ভাল। এখানে স্বাধীন-ভাবে কাজ করা যায়। মান-সম্মানও আছে যথেষ্ট।

কিন্তু আজকাল ব্যবসা বলতেই আমরা বুঝি ফাঁকিবাজি, ভেজাল, ধোঁকাবাজি, মাপে-ওজনে গরমিল, প্রতারণা—এমনি আরও অনেক কিছু।

এতে করে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায়। অল্প সময়ে গাড়ি-বাড়ি বানানো যায়। কিন্তু এভাবে টাকা-পয়সা আয় করা অন্যায়। মস্তবড়

অপরাধ। এই পয়সা হারাম—অপবিত্র। এ ধরনের ব্যবসার ফলে জনগণের দুঃখ-কষ্ট বাড়ে। সমাজের অকল্যাণ হয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজে তেজারতি করতেন। অপরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু যে ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন নীতি নেই, কোন সততা নেই, সে ব্যবসাকে তিনি অপসন্দ করতেন, ঘৃণা করতেন।

ব্যবসা করতে গিয়ে তিনি কোন রকম ফাঁকিবাজি, ধোঁকাবাজি, মিথ্যা বা ভেজালের আশ্রয় নিতেন না। বরং সযত্নে এগুলো এড়িয়ে চলতেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তখন উটের ব্যবসা করেন।

একবার তিনি বিদেশী বণিকদের নিকট কতগুলো উট বিক্রয় করলেন। মূল্য পরিশোধ করে বণিকেরা উট নিয়ে তাদের গন্তব্যে রওয়ানা হল।

এদিকে আর-এক ঘটনা ঘটে গেল।

মহানবী (সা.) যে উটগুলো বিক্রি করেছেন—তার মধ্যে একটি উট ছিল বেশ দুর্বল—খোঁড়া, ভালভাবে হাঁটতে পারত না। খোঁড়া উটটি সম্পর্কে তিনি বণিকদের কিছুই বলেন নি। বণিকেরাও তা টের পায় নি। ভাল উটগুলো যে দামে বিক্রি হয়েছে খোঁড়া উটটিও সেই একই দামে বিক্রি হয়েছে।

খোঁড়া উটটির কথা মনে হতেই মহানবী (সা.) চিন্তায় পড়লেন। পায়চারি করতে লাগলেন অস্থিরভাবে। তিনি ভাবলেন, এ তো অন্যায়। এভাবে উপার্জন করা অর্থ তো অপবিত্র। বণিকেরা উটের আসল অবস্থা সম্পর্কে না জানতে পারে, কিন্তু তিনি তো উটের অবস্থা সম্পর্কে জানেন। তিনি তো উটের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে বলে দিতে পারতেন।

এমনি ধরনের নানান ভাবনা মহানবী (সা.)-এর মনে। তিনি তাঁর কর্তব্যকর্ম ঠিক করে ফেললেন। স্থির করলেন, যে করেই হোক, বণিকদের খুঁজে বের করতে হবে।

তিনি একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় উঠে বসলেন। দ্রুত ছুটিয়ে দিলেন, যে পথে বণিকেরা উট নিয়ে গেছে ঠিক সেই পথে।

অল্প সময়ের মধ্যেই এসে পৌঁছলেন বণিকদের কাছাকাছি। মহানবী (সা.)-কে এভাবে আসতে দেখে বণিকেরা একটু চিন্তিত হল। তারা ভাবল, তাহলে কি আমরা কম মূল্য দিয়ে এসেছি? দু'-একটি উট বেশি আনা হয় নি তো?

বণিক সর্দার হযরতের কাছে গিয়ে বলল ঃ আপনি কেন আমাদের পিছু পিছু ছুটে এসেছেন? আমরা তো সমস্ত মূল্য পরিশোধ করে এসেছি। একটি উটও তো আমরা বেশি আনি নি।

হযরত বললেন ঃ আপনাদের কাছে আমার যে টাকা পাওনা, আপনারা তার চেয়ে বেশি দিয়েছেন। তাই বলতে এসেছি।

হযরতের কথা শুনে বণিক সর্দারের চোখ তো একেবারে ছানাবড়া। সে বলল ঃ সত্যি কি আমরা টাকা বেশি দিয়ে এসেছি? কত টাকা বেশি দিয়েছি?

মহানবী (সা.) ঘটনা খুলে বললেন। বললেন ঃ আপনারা যে উটগুলো কিনেছেন, তার মধ্যে একটি উট খোঁড়া। আপনারা তা লক্ষ্য করেন নি। ভাল উট যে দামে কিনেছেন, খোঁড়া উটটির জন্যেও একই দাম দিয়েছেন। আসলে খোঁড়া উটটির দাম কম হবে।

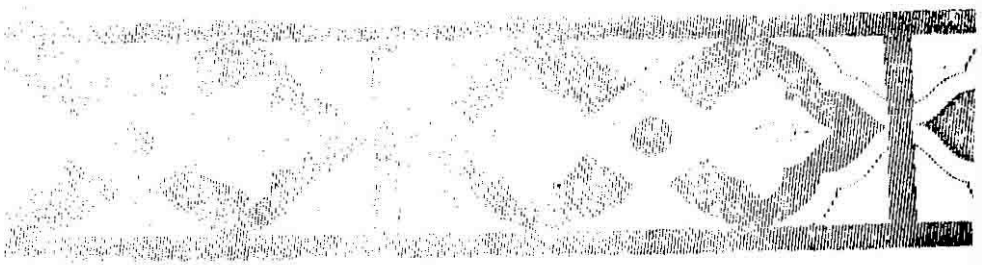

সেবারে এক যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হল। অনেক লোকজন বন্দী করে মদীনায় আনা হল। হযরত ফাতিমা (রা.)ও এই বন্দীদের কথা জানতে পারলেন।

তিনি ভাবলেন—আব্বাকে বলে-কয়ে একজন বন্দী নিয়ে এলে মন্দ হয় না। তাতে কাজের চাপ অনেকখানি কমে যাবে। হাতে বেশ অবসর থাকবে। এই সময়টাতে যিকির-আযকার করে কাটান যাবে।

তিনি অনেক আশা নিয়ে ছুটে এলেন মহানবী (সা.)-এর কাছে। বললেন ঃ আব্বাজান, আমি একটি প্রার্থনা নিয়ে আপনার দরবারে এসেছি।

নবীজী কন্যাকে আদর করলেন। তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন! প্রার্থনা পেশ করতে বললেন।

ফাতিমা (রা.) পিতাকে হাতের ফোস্কা, পাঁজরের দাগ দেখালেন। কাতরকণ্ঠে বললেন ঃ সংসারের কাজের চাপ আর সইতে পারি না। কাজ করতে করতে হাতে; পাঁজরে দাগ পড়ে গেছে। অনুগ্রহ করে যুদ্ধবন্দীদের একজন আমাকে দান করুন।

নবীজী ফাতিমার প্রার্থনা শুনলেন। মেয়ের কষ্টের কথা মনে করে অন্তরে ব্যথা পেলেন। কিন্তু তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করতে পারলেন না। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ ওহদের যুদ্ধে অনেক শিশু এতিম হয়েছে। তারা এখনও দুরবস্থায় আছে। তাদের তুলনায় মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমার দাবী বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বন্দী বন্টনের ক্ষেত্রে সেই এতিম শিশুরাই অগ্রাধিকার পাবে।

নবীকন্যা এর কি জবাব দেবেন?

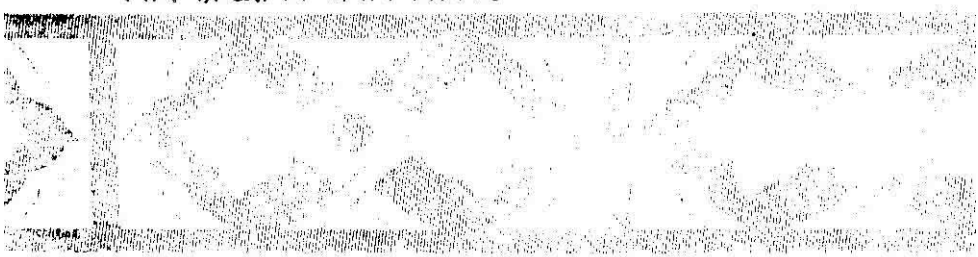

তিনি ফিরে এলেন নিজের ঘরে। মনে মনে ভাবলেন—সত্যিই তো। মদীনায় এখনও অনেক এতিম দুস্থ লোক রয়েছে। তাদের অভাব-অভিযোগের তুলনায় নিজের অভাব-অভিযোগ তো খুবই সামান্য। তাহলে এত কাতর হওয়া কেন? ছি! ছি! তাদের সামনে একথা বলতেও তো লজ্জা হয়! না, কোন লোকজনের দরকার নেই। এভাবেই চলুক।

কিন্তু এভাবে বেশি দিন চলল না। ফাতিমার কষ্টের কথা নবীজীর অন্তরে গেঁথে রইল। অন্যদের প্রয়োজন শেষ হলে কবে ফাতিমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতে পারবেন সে কথাই তিনি ভাবছিলেন।

খয়বরের যুদ্ধে সে সুযোগ এসে গেল। এবারেও অনেক শত্রু বন্দী হল। তিনি একজন বন্দীকে পাঠিয়ে দিলেন ফাতিমার ঘরে।

কাজের লোক তো পাঠালেন। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর দুশ্চিন্তা কমল না। ফাতিমা যদি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করে? তাকে দিয়েই যদি সংসারের সমস্ত কাজ করায়? তাহলে যে বন্দীরও কষ্ট হবে! আল্লাহ্ যে অসন্তুষ্ট হবেন! এটাতো অন্যায়। মস্তবড় অপরাধ।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাই সঙ্গে সঙ্গে ফাতিমাকে ডেকে পাঠালেন। উপদেশ দিয়ে বললেন ঃ ঘরের অর্ধেক কাজ তুমি করবে। বাকি অর্ধেক ওকে দিয়ে করিও। দু'জনে মিলে যাঁতা পিষবে। যা তুমি নিজে খাবে, ওকেও তাই খেতে দেবে।

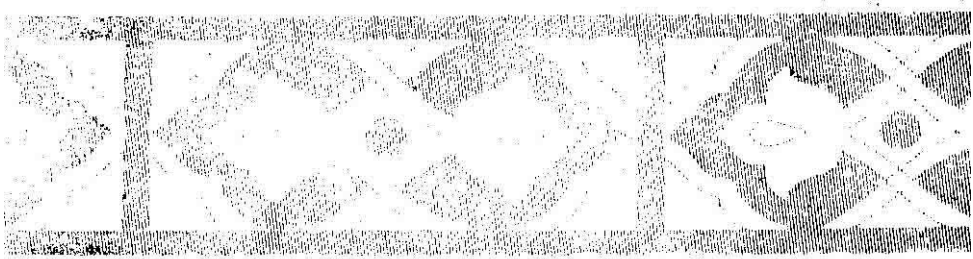

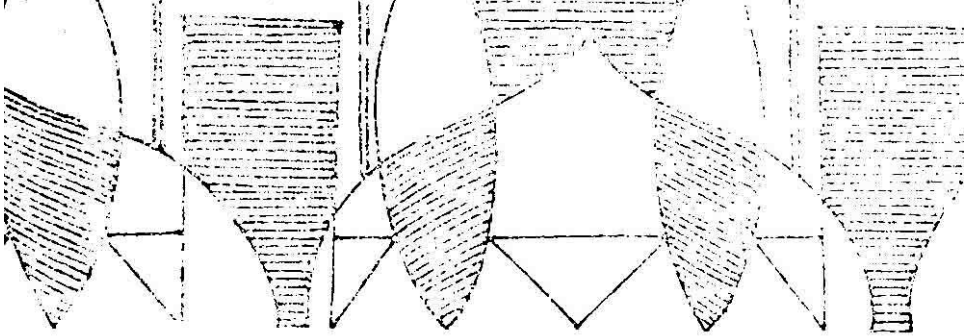

তোষামোদ নয়

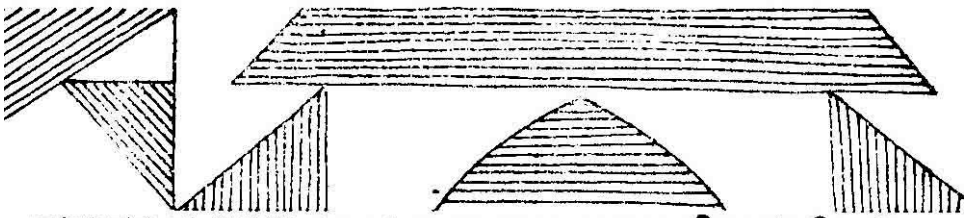

তোষামোদ বা প্রশংসা কে না পসন্দ করে। রসূলে করীম (সা.) কিন্তু ছিলেন একেবারে অন্যরকম। তিনি কোন প্রকার তোষামোদ পসন্দ করতেন না। কেউ তোষামোদ করলে, অতিরিক্ত প্রশংসা করলে তিনি বিরক্ত হতেন। প্রশংসাকারীকে ঘৃণা করতেন মনে-মনে।

রসূল (সা.) একদিন মসজিদে এ:সছেন। সঙ্গে রয়েছেন সাহাবী মেহজান।

রসূল (সা.) দেখলেন—এক ব্যক্তি মসজিদের এক কোণে নামায পড়ছে। নামাযে তার ভীষণ মনোযোগ। আর কোনদিকে খেয়াল নেই। সে যেন একেবারে অন্য জগতের মানুষ। লোকটিকে এভাবে নামায পড়তে দেখে রসূলের খুব ভাল লাগল। লোকটির পরিচয় জানার জন্যে রসূলের ইচ্ছে হল।

তিনি সাহাবী মেহজানকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ঐ যে লোকটি নামায পড়ছে, তুমি কি তাকে চেন ? লোকটি কে ?

মেহজান লোকটিকে চিনতেন। তিনি রসূলের কাছে লোকটির পরিচয় দিলেন। লোকটি সম্পর্কে প্রশংসা করতে শুরু করলেন।

রসূলে করীম (সা.) কিন্তু এতটা প্রশংসা পসন্দ করলেন না। তিনি একটু বিরক্ত হলেন। মেহজান রসূলের এই মনোভাব বুঝতে পারলেন না। তিনি আরও বেশি বেশি প্রশংসা করতে লাগলেন।

অবশেষে রসূলে করীম (সা.) মেহজানকে থামিয়ে দিলেন। লোকটি সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশংসা করতে নিষেধ করলেন। বললেন ঃ দেখ, এই ব্যক্তি যেন তোমার প্রশংসা শুনতে না পায়।

হঠাৎ করে রসূলের নিষেধ শুনে মেহজান একটু থতমত খেয়ে গেলেন। তখন তিনি একেবারেই চুপ। কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। তাঁর মনে শুধু একটাই প্রশ্ন—রসূলে করীম (সা.) বিরক্ত হলেন কেন ? কেন তাঁকে প্রশংসা করতে নিষেধ করলেন ? তিনি কি তাহলে মিথ্যা বলেছেন ?

মেহজান সহসা কোন কথা বললেন না। মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। উসখুস করছেন। রসূলের নিষেধ করার কারণ তাঁকে জানতে হবে। অবশেষে কাচুমাচু করে তিনি এর কারণ জানতে চাইলেন।

সাহাবীর প্রশ্নে রসূলে করীম (সা.) কোনরূপ বিরক্ত হলেন না। তিনি অল্প কথায় মেহজানের প্রশ্নের জবাব দিলেন। বললেন ঃ তোমার প্রশংসা বাক্য শুনলে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে।

মেহজান বুঝলেন যে—তোষামোদ বা প্রশংসা মানুষের মনে অহংকার সৃষ্টি করে। মানুষের মনকে দুর্বল করে দেয়। তখন সে উচিত-অনুচিতের কথা ভুলে যায়। অন্যায়ভাবে তোষামোদ ও প্রশংসাকারীকে খাতির করে। পরিণামে তা মানুষের জন্যে অপরিসীম ক্ষতি বয়ে আনে।

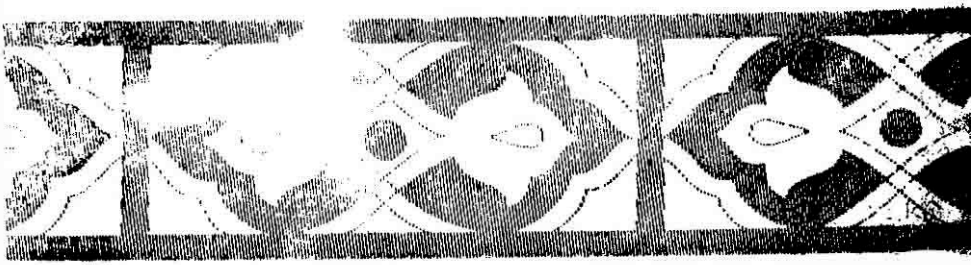

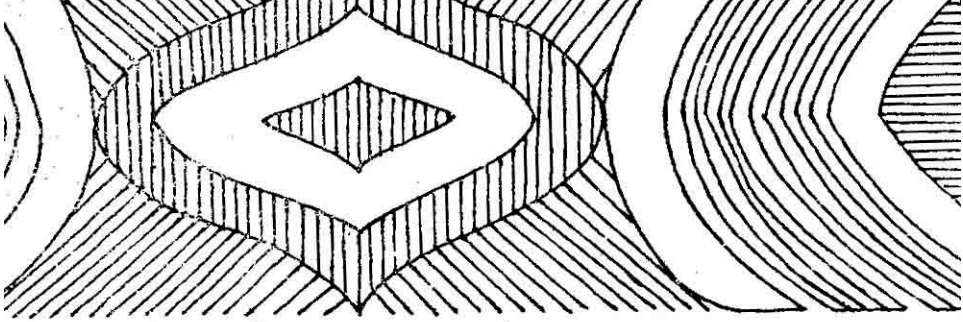

আইনের চোখে

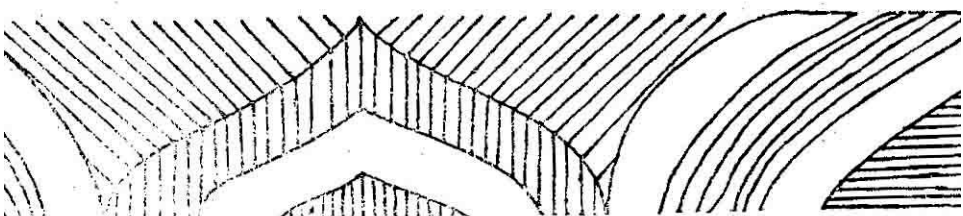

মেয়েলোকটি লোভ সামলাতে পারল না। এমন শখের জিনিস সে হাতছাড়া করে কিরূপে? সুযোগ পেয়েই সে জিনিসটি চুরি করল। কিন্তু চুরি করলে হবে কি? পালিয়ে যাওয়ার আগেই সে ধরা পড়ে গেল। হাজির করা হল মহানবীর দরবারে। সেখানেই তার বিচার হবে।

মহানবী (সা.) দরবারে বসলেন। পক্ষে-বিপক্ষে সকলেরই সাক্ষ্য-প্রমাণ নিলেন। দেখা গেল—মেয়েলোকটি সত্যিই চুরি করেছে। প্রকৃতপক্ষে সেই দোষী। শরীয়তের নিয়ম অনুসারে মহানবী (সা.) বিচারের রায় দিলেন। মেয়ে লোকটির হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়া হল।

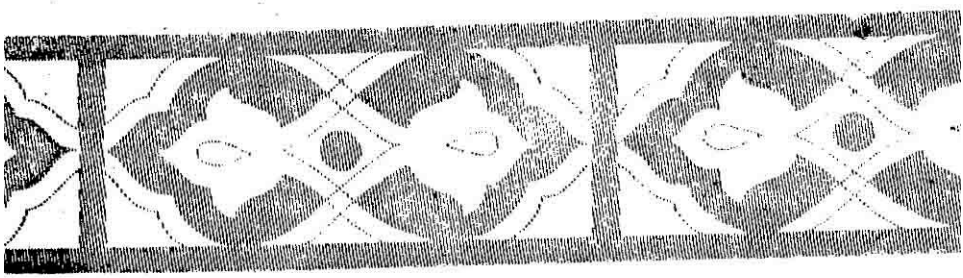

বিচারের রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে তুমুল কানা-ঘুষা শুরু হল। সবার মুখে একই কথা ঃ তা'হলে মখজুম বংশের মেয়েরও হাত কাটা যাবে?

আসলে মেয়েলোকটি ছিল মখজুম বংশের মেয়ে। আর সে আমলে মখজুম বংশের নাম-ডাক ছিল দেশের সর্বত্র। মেয়েলোকটির আত্মীয়-স্বজনও ছিল খুবই সম্মানী ও প্রভাবশালী। তারা ভাবল ঃ হাত যদি সত্যি-সত্যিই কাটা যায়, তা'হলে তো খুবই লজ্জার কথা। বংশের মান-সম্মান সব যাবে। যে করেই হোক, বিচারের রায় পাল্টাতেই হবে।

কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে কে এ বিষয়ে সুপারিশ করবে? এমন সাহস কার? তা'ছাড়া তিনি তো সহজে বিচারের রায় পাল্টাবার মানুষ নন।

তারা অনেক খোঁজাখুঁজি করল। এর কাছে ওর কাছে ধরনা দিল। কিন্তু কেউ রসূলের কাছে সুপারিশ করতে রাজি হল না।

অবশেষে তারা হযরত উসামার শরণাপন্ন হল। হযরত উসামা (রা.) ছিলেন রসূলের প্রিয় পাত্র। তারা ভাবল—উসামার অনুরোধ রসূলুল্লাহ্ (সা.) সহজে ফেলতে পারবেন না। সুতরাং যে করে হোক, সুপারিশ তাঁকে দিয়েই করাতে হবে।

অবশেষে স্ত্রীলোকটির কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন উসামার নিকট হাজির হল। অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাদের কথা জানাল। বলল ঃ এই মহিলা খুবই অভিজাত বংশের। চুরির অপরাধে হাত কাটার হুকুম হয়েছে। আমরা তার অপরাধ স্বীকার করছি। কিন্তু তার হাত কাটা গেলে যে বংশের মুখে চুনকালি পড়বে। আপনি দয়া করে রসূলের নিকট একটু সুপারিশ করুন। হাত না কেটে অন্য যে কোন শাস্তি দেয়ার জন্যে অনুরোধ করুন।

অনেক বলা-কওয়ার পর হযরত উসামা (রা.) রাজি হলেন। মহিলাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে রসূলের নিকট সুপারিশ করলেন।

রসূলুল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র হযরত উসামা (রা.)। কিন্তু ন্যায়বিচারের প্রশ্নে উসামার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না রসূল (সা.)। তিনি উসামার প্রতি বিরক্ত হলেন। এমন অন্যায় আবদারের জন্যে অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন ঃ হে উসামা! বনি ইসরাইল জাতি এই দুর্বলতার জন্যে ধ্বংস হয়েছে। তারা সাধারণ অপরাধের জন্যে গরীব লোককে গুরুতর শাস্তি দিত। কিন্তু কোন বড়লোক গুরুতর অপরাধ করলেও তাকে ক্ষমা করে দিত।

রসূল (সা.) একটু থামলেন। উসামা (রা.) মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। রসূল (সা.) আবার বলতে লাগলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি এরূপ অপরাধ করত, তা'হলে সেও ক্ষমা পেত না। তারও হাত কাটার হুকুম হত।

রসূলুল্লাহ্‌র কথা শুনে উসামা (রা.) আর কোন কথা বলতে সাহস পেলেন না। বিচারের রায় মতে মহিলার হাত কেটে ফেলা হল।

বিচারের ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, ছোট-বড়, আশরাফ-আতরাফের কোন ভেদ নেই। এখানে সবাই সমান।

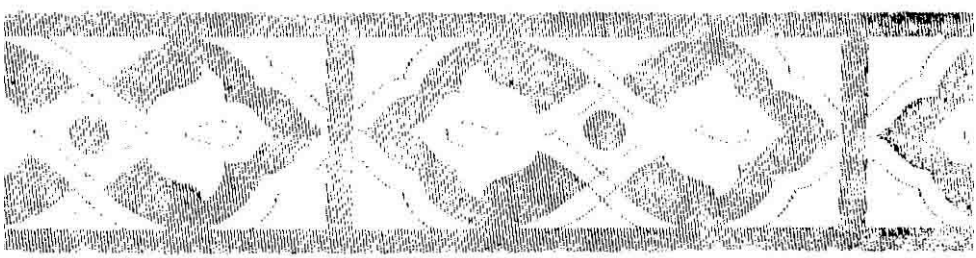

বিলাসবাড়ি

লোকটি বেশ শৌখিন। টাকা-পয়সাও যথেষ্ট। যখনই যা কিছু করতেন, বেশ জাঁকজমকের সাথেই করতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পয়সা খরচ করতে কখনও দ্বিধা করতেন না।

তিনি একটি বাড়ি তৈরি করলেন। বেশ সুন্দর। একেবারে সাজানো গোছানো।

তিনি ভাবলেন—বাড়িতে একটি গম্বুজ থাকলে মন্দ হয় না। বেশ উঁচু একটি গম্বুজ। বাড়িটি তখন দেখতে বেশ সুন্দর লাগবে। দূর থেকে সহজে চেনা যাবে।

যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি গম্বুজ তৈরি করে ফেললেন। বাড়িটি তখন চমৎকার দেখাচ্ছিল।

একদিন নবীজী ঐ বাড়ির কাছ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। সঙ্গে রয়েছেন বেশ কয়েকজন সাহাবী। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করতে করতে তাঁরা পথ চলেছেন। বাড়িটি নজরে পড়তেই নবীজী দাঁড়িয়ে পড়েন। বাড়ির সাজগোজ দেখেন। জাঁকজমক লক্ষ্য করেন। উঁচু গম্বুজের দিকে বারকয়েক তাকান।

এভাবে কেটে যায় কিছুক্ষণ। সাহাবীগণ সবাই চুপচাপ। একসময়ে নবীজী জিজ্ঞেস করেন ঃ এই বাড়িটি কার?

সাহাবীগণ লোকটির নাম বলে দেন। একজন মুসলমান। আনসারদের দলভুক্ত।

নবীজী গম্ভীর হয়ে পড়েন। চোখেমুখে তাঁর অসন্তোষের ছাপ। নবীজীর বিরক্তির কারণ সাহাবীগণের বুঝতে কষ্ট হয় না।

কারও মুখে কোন কথা নেই। কেউ কোন মন্তব্য করেন না। নবীজীও নীরবে পথ চলতে শুরু করেন। সাহাবীগণও তাঁকে অনুসরণ করে এগিয়ে যান সামনের দিকে।

দিনকয়েক পরের ঘটনা।

নবীজী মজলিসে বসে আছেন। সাহাবীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন শিক্ষা দিচ্ছেন। এমন সময় গম্বুজওয়ালা বাড়ির সেই লোকটি এসে হাজির। তিনি নবীজীকে সালাম দেন।

লোকটিকে দেখে নবীজীর চোখেমুখে আবার বিরক্তির ছাপ ফুটে ওঠে। তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন।

লোকটি ভাবলেন ঃ নবীজী সম্ভবত তাঁর সালাম শুনতে পাননি। তিনি আবার রসূলের মুখোমুখি একটু উচ্চৈঃস্বরে বললেন ঃ আস্‌সালামু আলায়কুম।

নবীজী এবারও সালামের জবাব দিলেন না। লোকটিকে ভালমন্দ কিছুই বললেন না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

এতক্ষণে লোকটি বুঝলেন—নবীজী নিশ্চয়ই তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

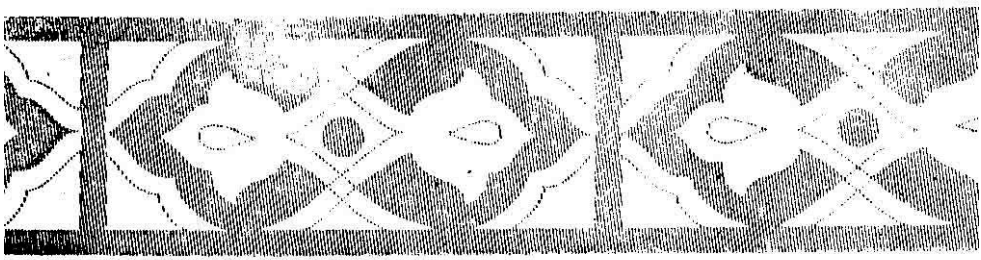

তা না হলে সালামের জবাব দেবেন না কেন? কেনই বা এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেবেন? তিনি এমন কি কাজ করেছেন, যে জন্যে নবীজী এত বিরক্ত হতে পারেন? লোকটি পড়লেন মহাভাবনায়। সাহস করে নবীজীকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে লোকটির সঙ্গে অন্যান্য সাহাবীর আলাপ হয়। তাঁরা বললেন—নবীজী একদিন তাঁর বাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাঁর বাড়িটি দেখেছেন। তারপর থেকেই তিনি অসন্তুষ্ট।

লোকটি মনে মনে ভাবলেন—সম্ভবত বিলাসবহুল হবার কারণে নবীজী তাঁর বাড়িটি পসন্দ করেন নি। বাড়ির জাঁকজমক বাড়াতে গিয়ে, গম্বুজ তৈরি করতে গিয়ে তিনি অনেক পয়সাই খরচ করেছেন। আর এ অপচয়ের জন্যেই হয়ত বা নবীজী তাঁর উপর বিরক্ত।

লোকটির মনে তখন ভীষণ অস্থিরতা, রসুল বিরক্ত হয়েছেন বলে।

তিনি ভাবলেন—আর বিলম্ব নয়। এক্ষুণি গম্বুজটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

তিনি আর দেরি করলেন না। সোজা বাড়ি চলে গেলেন। লোকজন ডাকলেন। এত সাধের সুন্দর গম্বুজটি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন।

তারও বেশ কয়েকদিন পরের ঘটনা।

নবীজী বাজারে রওয়ানা হয়েছেন। গম্বুজওয়ালা বাড়ির পাশ দিয়েই পথ। পথ চলতে চলতে সেদিনও তিনি বাড়িটির দিকে তাকালেন। কিন্তু সেই গম্বুজটি দেখতে পেলেন না।

তিনি সাহাবীগণকে গম্বুজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন যে, বাড়ির মালিক গম্বুজটি ভেঙে ফেলেছেন। মুহূর্তে নবীজীর বিরক্তির ভাব কেটে গেল। তিনি মৃদু হাসলেন। বললেনঃ বাড়িঘর মানুষের জন্যে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুই ভাল নয়। কারণ, অতিরিক্ত জাঁকজমক, বড় ইমারত মানুষের জন্যে দুর্ভোগ বয়ে আনে।

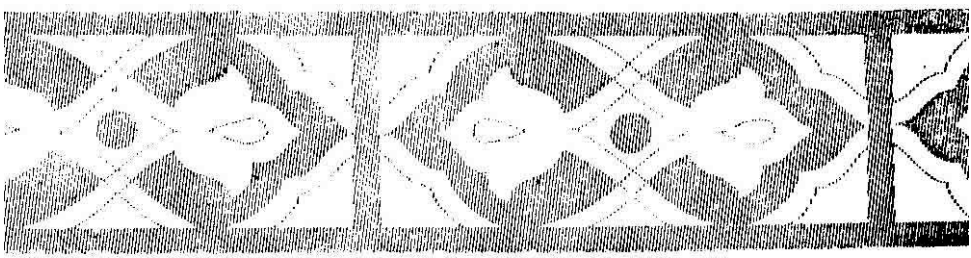

গল্পসূত্র

সমাধান : সীরাতে ইবনে হিশাম / ১ খণ্ড।
যুবকের মুখোমুখি : বুখারী শরীফ / জিহাদ খণ্ড।
বিদায় রাতে : সীরাতে ইবনে হিশাম ; তাবারী।
সবাই সমান : মুসনাদে আহমদ / ১ খণ্ড।
ওয়াদা : বুখারী শরীফ, সীরাতে ইবনে হিশাম।
মায়া : আবু দাউদ শরীফ।
সম্মান : আবু দাউদ শরীফ।
সরল জীবন : মুসলিম শরীফ : নাসায়ী শরীফ।
দায়িত্ব : বুখারী শরীফ।
ব্যবহার : সীরাতে ইবনে হিশাম।
অপরাধ : আবু দাউদ শরীফ।
সবার জন্যে : মিশকাত শরীফ।
আড়ম্বর নয় : আবু দাউদ শরীফ।
সততার শপথ : মুসলিম শরীফ।
সমান সমান : আবু দাউদ শরীফ।
তোষামোদ নয় : আদাবুল মুফরাদ।
আইনের চোখে : বুখারী শরীফ।
বিলাসবাড়ি : আবু দাউদ শরীফ।

ইফাবা/৮৮-৮৯ উ/প্র-৩১২৬/৫২৫০